Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

চতুর্থ বর্ষ ■ সংখ্যা ৩ - ডিসেম্বর ২০১৪

সম্পাদকীয়

ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় রাষ্ট্র

নিবন্ধ

ইবোলা ভাইরাস এইচআইভি'র মতই উদ্ভাবিত একটি শক্তিশালী জীবাণু অস্ত্র

সাক্ষাৎকার

ন্যায্যমূল্যের ওষুধ – জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশন – অযৌক্তিক অপ্রয়োজনীয়, নিষিদ্ধ ওষুধ প্রসঙ্গে হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন

❖এছাড়া অন্যান্য নিয়মিত কলাম❖

–ঃ সূচীপত্র ঃ–

সম্পাদকীয় ঃ	ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় রাষ্ট্র	৩
বিশেষ রচনা ঃ	শালগ্রাম শিলা এবং তার মাহাত্ম	৫
পাঠকের কলাম ঃ	জলবায়ু পরিবর্তন কার্বন ডাই অক্সাইড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়	১১
	বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণবৃদ্ধিতে কি পরিবেশ নিষ্ক্রিয়	১২
চিঠিপত্র ঃ		১৩
নিবন্ধ ঃ	ইবোলা ভাইরাস এইচআইভি'র মতই উদ্ভাবিত একটি শক্তিশালী জীবাণু অস্ত্র	১৫
জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধান ঃ	আমরা খুব ছোটবেলার কথা মনে রাখতে পারি না কেন?	২৫
	সৃষ্টিশীলতা কি ঈশ্বরপ্রদত্ত	২৬
কুসংস্কার টিঁকিয়ে রাখে কারা ঃ	নেতা-মন্ত্রী ও শিক্ষিত নামী-দামী লোকেরা	২৭
সাক্ষাৎকার ঃ	ন্যায্যমূল্যের ওষুধ ... নিষিদ্ধ ওষুধ প্রসঙ্গে হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন	২৯
বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ	'ফিলি'র ধূমকেতু বিজয়	৩৬
	বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ ২০১৪	৩৮
সংগঠন সংবাদ ঃ	বিভিন্ন অঞ্চলের রিপোর্ট	৪০
সাক্ষাৎকার ঃ	তরাইয়ের চা বাগিচায় শিক্ষার চালচিত্র	৪১
	এনসেফালাইটিস প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ডাক্তারদের মতামত	৪৩
বিজ্ঞানের খবর ঃ		৪৫

সম্পাদকীয়

ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় রাষ্ট্র

মানুষ সহ সমস্ত জীবজন্তু, পৃথিবী তথা বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিতত্ত্বকে ভিত্তি করেই অতীতে সৃষ্টি হয়েছিল ধর্ম। ধর্মের মধ্যদিয়েই মানুষ তার মনের কোণে সৃষ্টি হওয়া জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে চেয়েছিল। প্রতিটি ধর্মই তার নিজের মতো করে বিশ্বব্রহ্মান্ড ও মানুষের সৃষ্টির রহস্যকে ব্যাখ্যা করেছে যা প্রধানতঃ গড়ে উঠেছিল ঈশ্বরবাদ বা শক্তিবাদকে কেন্দ্র করে। যেমন বাইবেলে উল্লেখিত রয়েছে যীশুই হলেন পরম ঈশ্বর, তাঁর ইচ্ছা সাপেক্ষেই সবকিছু ঘটে চলেছে। 'কোরান'এ উল্লিখিত রয়েছে আল্লাহ-ই হলেন এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই রক্ষাকর্তা এবং তিনিই বিনাশকর্তা। কোথায় কখন কি ঘটবে তা কেবলমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ 'ত্রিপিটক'-এ উল্লেখ রয়েছে বুদ্ধের বাণী। হিন্দুদের সেই অর্থে কোন ধর্মগ্রন্থ নেই। বেদ-উপনিষদ, পুরাণ ও বিভিন্ন হিন্দু মহাকাব্য যেমন রামায়ণ, মহাভারতে উল্লিখিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সংমিশ্রনই হল হিন্দুত্ববাদ। হিন্দুত্বের প্রচলিত মতগুলির কেন্দ্র বিন্দু হল কাল্পনিক দেবদেবীর বিজয় গাথা ও স্তুতি। বাইবেলে যীশুকে, কোরানে মহম্মদকে, ত্রিপিটকে বুদ্ধ কে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে দেখানো হয়েছে। যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধের লৌকিক জীবনকে ধর্মের প্রচারক বা পৃষ্ঠপোষকেরা কখনই তুলে ধরেন না। তুলে ধরেন না, কোন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে ধর্মসমূহের আবির্ভাব হয়েছিল।

পুরাতন ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় অনুশাসনের অধীনে রেখে সমাজের পরিচালক মন্ডলী তাদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখলেও সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ধর্মমতের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মধ্যযুগে পুরনো ধর্মমতের সংস্কার এবং নতুন নতুন ধর্ম প্রবর্তনের পিছনে আছে পুরানো উৎপাদন পদ্ধতির গর্ভে নতুন উৎপাদন পদ্ধতির সঞ্চার। যেমন রোমান সাম্রাজ্যে দাস ব্যবস্থার ভাঙন ও শ্রমজীবী জনতার বিদ্রোহের সময় যীশুখ্রীস্টের মতবাদের আবির্ভাব হয়। আরবের দাস প্রথা ভিত্তিক পৌত্তলিক শাসকশ্রেণীর সঙ্গে উদীয়মান বণিক পুঁজির ধারকদের সংঘাত থেকে বণিক পুঁজির সমর্থনে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হয়। ঐ পর্যায়ে পুরাতন উৎপাদান পদ্ধতির ধারকদের সঙ্গে নতুন উৎপাদন পদ্ধতির ধারকদের সংঘাত লেগেই থাকত। যেহেতু সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতি সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং মানুষের ইচ্ছানিরপেক্ষ তাই পুরাতন পদ্ধতির ধারকরা নতুন পদ্ধতির ধারকদের সাথে প্রাথমিকভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হলেও পরবর্তীতে নতুন পদ্ধতির ধারকদের সঙ্গে আপস করে নিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকত বা ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিত। উদাহরণস্বরূপ রোমের যে শাসকশ্রেণী খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশুকে ক্রুসবিদ্ধ করে হত্যা করেছিল, (আনুঃ ৩রা এপ্রিল ২৯ খ্রী) যে শাসকশ্রেণীর সম্রাট নীরো খ্রীষ্টানদের নির্বিচারে ও নির্মমভাবে হত্যা করেছিল (৬৪ খ্রীঃ), সেই শাসকশ্রেণীর সম্রাট কনস্টান্টাটাইন খ্রীষ্ট ধর্মকে বৈধ ঘোষণা করেন (৩১৩ খ্রীঃ) এবং নিজে এই ধর্মে দীক্ষা নিয়ে (৩২৬ খ্রীঃ) তার প্রচারক বনে গিয়েছিলেন। আরব দুনিয়ার শাসকশ্রেণীও বণিক পুঁজির পৃষ্টপোষক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সঙ্গে এই ধর্মের প্রচারক বনে গিয়েছিল। ভারতের সম্রাট অশোক সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনে বণিক পুঁজির পৃষ্ঠপোষক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

অতীতে সমাজে গোষ্ঠীপতি ও সমাজ পরিচালকরাই ছিলেন ধর্মের সৃষ্টিকর্তা তথা প্রধান কান্ডারী। তাদের দ্বারা কথিত ঐশ্বরীক ও অলৌকিক গল্প গাথার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টি করার ও তা জিইয়ে রাখার প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে গেছে। আবার বিভিন্ন ধর্মের পরিচালকমন্ডলীর নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের কারণে তা বিভিন্ন সম্প্রদায় বা সংঘে বিভাজিত হয়েছে। খ্রীস্টান ধর্ম, ইসলামধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম প্রত্যেক ধর্মের ক্ষেত্রেই অন্ত ধর্মীয় বিভাজন ঘটেছে। যেমন বাইবেল অনুসারীরা বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান ছাড়াও রেষ্টোরেশনিষ্ট, ব্যাপটিস্ট, ওরিয়েন্টাল, অর্থোডক্স ইত্যাদিতে বিভক্ত। এরা সবাই বাইবেল অনুসারী হলেও এদের মধ্যে দ্বন্দ্বের মাত্রা এতটাই গভীর ছিল যে এদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধও নিষিদ্ধ ছিল। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর প্রধানতঃ সিয়া ও সুন্নী এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও, তারা আরও উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেমন সুন্নী সম্প্রদায় মাজহাবী, লামাজহাবী, আহমদিয়া, মহম্মদীয়া ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত হয়। এরা প্রায়শই পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত থাকে, যার ধারা আজও পৃথিবী জুড়ে ঘটে চলেছে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতমবুদ্ধের মৃত্যুর পর হীনযান ও মহাযান এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হীনযান গোষ্ঠী হল প্রাচীনপন্থী যারা মনে করেন বুদ্ধ একজন মানুষ ছিলেন। অন্যদিকে মহাযান গোষ্ঠী বুদ্ধকে ঈশ্বর মনে করতেন এবং তাকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে তার আরাধনা করার কথা প্রচার করেন। বর্তমানে মহাযান গোষ্ঠীই হল বৌদ্ধধর্মের প্রধান ধারক ও বাহক। পরবর্তী কালে ঐ দুই গোষ্ঠী বিভিন্ন উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায় বর্তমানে হীনযান গোষ্ঠী সাতটি ও মহাযান গোষ্ঠী প্রায় আঠারটি সংঘে বিভক্ত। জৈন ধর্মাবলম্বীরা ও শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুই প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত। আর হিন্দুধর্ম কোন প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম নয় এবং নিজেদের হিন্দু পরিচয় দেন এমন মানুষরা শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব ইত্যাদি শত শত গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এছাড়া

হিন্দুসমাজের জাতিপ্রথা তাদের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজনরেখা টেনে রেখেছে।

যে মতবিরোধের কারণে অন্তধর্মীয় বিভাজনগুলি সংগঠিত হয়েছিল তা নিজ নিজ ধর্মের মূল সিদ্ধান্তকে কখনই চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দেয়নি। বরং বিভাজনগুলি সংগঠিত করা হয়েছে ধর্মীয় নেতৃত্ব ও আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দখল করার কায়েমী স্বার্থ জনিত দ্বন্দ্ব হতে।

অন্যদিকে সামাজিক উৎপাদনের স্বাভাবিক বিকাশ এবং উৎপাদনে প্রযুক্তির ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োগ সাধারণ মানুষের চেতনার বিকাশকে আরও ত্বরান্বিত করল। ধর্মগ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত দেবদেবীদের অলৌকিক কাহিনী ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে ধর্মীয় বিশ্লেষণ সাধারণ মানুষের অগ্রনী অংশের কাছে ক্রমশ গ্রহণযোগ্যতা হারাতে লাগল। সমাজের বুকে ঘটে চলা সমস্ত ঘটনা ও ধর্মীয় সিদ্ধান্তগুলিকে যুক্তি দিয়ে বিচার করার প্রবণতা হতে সৃষ্টি হল যুক্তিবাদের। ধর্মীয় কঠোর অনুশাসনের মধ্যে থেকে সাধারণ মানুষ যে মুক্তি পাবার স্বপ্ন দেখেছিল, যুক্তিবাদের মধ্যে যেন ঐ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার ঈঙ্গিত পেল তারা। খুব তাড়াতাড়ি যুক্তিবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করল। যুক্তিবাদের বিকাশও তার প্রসারের ফলে ধর্মীয় তত্ত্বগুলি কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যায়। তদানিন্তন ধর্মভিত্তিক সমাজব্যবস্থার নেতৃত্বে অবস্থান করা ধর্মগুরু, পোপ ও বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠানের পরিচালক গোষ্ঠী নিরূপায় হয়ে ধর্মে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যেকোন রকম বিরোধিতা এবং এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। বাইবেলে বর্ণিত ভূকেন্দ্রিক কাল্পনিক জগতের বিরোধিতা করে সূর্যকেন্দ্রিক জগতের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের রূপকারদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয় এমনকি জীবন্ত দগ্ধ করতেও তারা পিছপা হয় নি। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাদের দ্বারা সৃষ্ট রাষ্ট্রকে কাজে লাগিয়ে এই ধরণের অমানবিক আক্রমণ সংগঠিত করলেও অজানাকে জানার বাসনা বিজ্ঞানীদের তথা জ্ঞানপিপাসু মানুষকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। বিপদ বুঝে ধর্মের রক্ষকরা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সরাসরি রাষ্ট্রীয় মদতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে ধর্মের প্রতি বিশ্বাসকে জিইয়ে রাখতে উদ্যত হয়।

এদিকে সামাজিক উৎপাদনে প্রথমে প্রযুক্তির প্রয়োগ পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের সচেতন প্রয়োগ সামাজিক উৎপাদন ও মানুষের সামাজিক চেতনার বিকাশকে বহুগুণে উন্নীত করার ফলে, সমাজ জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ ক্ষীন হতে ক্ষীনতর হতে থাকে। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই চেতনা প্রসারিত করার ফলে তার জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কার্যত শেষ হলেও রাষ্ট্রের কাছে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা নতুন করে দেখা দিল। রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে ধর্ম হল এখন তার হাতিয়ার। যে ধর্মের রূপ পূর্বাপেক্ষা আরও বেপরোয়া, আরো হিংস্র, আধুনিক অস্ত্র সম্ভারে সুসজ্জিত। নয়া জমানার, নয়া রূপের ধর্মের নাম ধর্মীয় মৌলবাদ। ঐতিহাসিকভাবে খ্রষ্টীয় মৌলবাদের জন্ম হয় ১৮৭৮ সালে নায়াগ্রা সম্মেলনের মধ্যদিয়ে। বাইবেলের পাঁচটি বুনিয়াদি বিশ্বাসকে যুক্তিহীন ও প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস রাখা হয় ঐ সম্মেলনে। যীশুর পবিত্র জন্ম, জগতের পাপ দূর করার জন্যই যীশুর মৃতু বরণ, শারিরীকভাবে যীশুর পুনর্জন্ম, যীশুর অলৌকিক ক্ষমতার ঐতিহাসিক বাস্তবতা – এই রকম পাঁচটি মৌলিক বিষয়কে চিহ্নিত করা হয় ঐ সম্মেলনে। ঐ পাঁচটি মৌলিককে যারা আপসহীন ভাবে বিশ্বাস করে ও তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বদ্ধপরিকর তাদের 'মৌলবাদী' নামে ডাকা হত। পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ধর্মেই একই রকম ভাবে মৌলবাদের জন্ম হয়।

বর্তমান যুগে শাসকশ্রেণী মানবজীবনে আফিমস্বরূপ এই ধর্ম এবং তাকে ভিত্তি করে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় মৌলবাদকে বিশ্বজুড়ে মদত দিয়ে চলেছে। কোথাও তা ইসলামিক মৌলবাদ, কোথাও হিন্দু মৌলবাদ, কোথাও বৌদ্ধ মৌলবাদ আবার কোথাও ক্রিশ্চান মৌলবাদ পৃথিবীর শ্রমজীবী জনতাকে বিভক্ত করে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সামিল করেছে। সর্বত্র ধর্মবাদকে মাথাচাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ভারতসহ কয়েকটি রাষ্ট্র যদিও ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্ম আওয়াজ দেয় কিন্তু সেই ধর্মনিরপেক্ষতা প্রকৃত অর্থে ধর্ম নিরপেক্ষতা নয়। ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ সর্বধর্ম সমন্বয়, সকল ধর্মকে উৎসাহ দান করা। রাষ্ট্রনেতারা প্রত্যহ সেই কাজই করে থাকেন। আর প্রত্যেক ধর্ম যেহেতু তার শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে এবং অন্যকে হেয় পতিপন্ন করে তাই হিংসার পরিবেশ জারি থাকে। রাষ্ট্রের একাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ নেয় আর অপর অংশ সংখ্যালঘুদের। প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ– রাষ্ট্র ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ অবস্থান নেবে। ধর্ম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আচরণের বিষয় থাকবে। রাষ্ট্র কোন ধর্ম (সংখ্যাগুরুর বা সংখ্যালঘুর) পক্ষ নেবে না এবং বৈজ্ঞানিক দর্শনের পক্ষ অবলম্বন করবে। ভারতরাষ্ট্রসহ অন্য মুষ্টিমেয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি এই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার পথ অবলম্বন করে না। উল্টো পথে চলে। এর বিষময় পরিণতি আজ আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করছি। যতদিন না রাষ্ট্রকে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণে আমরা বাধ্য করতে পারব ততদিন সমাজ থেকে সাম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধ হতে পারে না। প্রতিটি বিজ্ঞান সংগঠনের এই লক্ষ্যে কাজ করা আজ জরুরি কর্তব্য। শিক্ষা-সংস্কৃতিকে ধর্মীয় ভাবাদর্শের কালিমা থেকে মুক্ত করা বিজ্ঞান সংগঠনের কর্তব্য। তাই আমাদের আশু কাজ হওয়া উচিৎ জনমানসে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ তুলে ধরা। শিক্ষাক্রম, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী প্রতিটি কার্য কলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, রাষ্ট্রনেতাদের প্রকাশ্যে ধর্মীয় আচরণ, ধর্মীয় উস্কানির বিরুদ্ধে মানুষকে জাগরিত করা। সকল প্রচার মাধ্যমের দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। ■

বিশেষ রচনা ঃ

শালগ্রাম শিলা এবং তার মাহাত্ম

শালগ্রাম শিলা (পেরিসফিংটিস)

হিন্দু ধর্ম অনুসারে সর্বজীবের পালক ভগবান বিষ্ণুর পবিত্র প্রতীক হল শালগ্রাম শিলা। 'শালগ্রাম শিলা মাহাত্ম ও পূজার ফল' শিরোনামে স্বামী বেদানন্দ সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় গত ৮ই নভেম্বর ২০১৪, একটি রচনা প্রকাশ করেছেন। রচনায় শালগ্রাম শিলা পূজার মাহাত্ম, ভগবান বিষ্ণুর প্রতীক এই শিলার পৌরাণিক ও বৈজ্ঞানিক জন্মবৃত্তান্তের 'এক উপাদেয় খিচুরি' পরিবেশন করে ঈশ্বরতত্ত্ব–ধর্মবাদ তথা হিন্দুধর্মের ভিত্তি যে সাংঘাতিকরকম বৈজ্ঞানিক তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

আজকের এই যুগে মানবজীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহার ছাড়া এক পাও চলা সম্ভব নয়। কোন কিছু অবৈজ্ঞানিক প্রতিভাত হলে মানুষ তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। একসময় প্রচলিত ভাববাদী ধারণার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে সামনে তুলে ধরায় ব্রুনো, গ্যালিলিওকে চরম শাস্তি পেতে হয়েছিল। আর বর্তমান সমাজের প্রভুরা অলৌকিক তত্ত্বকে বিজ্ঞানের মোড়কে হাজির করে, বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে মেনে নিয়ে বলে সবকিছুই প্রাকৃতিক নিয়মে হচ্ছে কিন্তু তা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায়। তাই ক্যাথোলিক খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরু পোপ হিগস বোসনের আবিষ্কার বা বিশ্বব্রহ্মান্ডের উৎপত্তির বিজ্ঞানকে মেনে নিয়ে বলেন – মহাবিশ্বের জন্মরহস্য নিয়ে বিগ ব্যাং তত্ত্ব সঠিক কিন্তু তা হয়েছে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায়। অন্য ধর্মের গুরুরাও একই কথা বলেন। তাঁরা কুসংস্কার এবং অবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মোড়কে পেশ করে আসলে ভয়ানক অপবিজ্ঞানের প্রচার করছেন। এই কাজের একটি সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হল সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় ৮ই নভেম্বর ২০১৪-তে প্রকাশিত শালগ্রাম শিলা সম্পর্কিত রচনাটি। আসুন বিজ্ঞানমনস্ক মন নিয়ে রচনাটির ধূর্তামির দিকটি খুঁজে বার করি এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় পৌঁছবার প্রয়াস নিই।

প্রথমে সমগ্র রচনার বিভিন্ন অংশে স্বামী বেদানন্দ মূখ্যত কি বলেছেন তা দেখে নেওয়া যাক।

'সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার অংশ'

রচনাটিতে স্বামী বেদানন্দ লিখেছেন "এই অনন্ত রহস্যভরা বিশ্বব্রহ্মান্ডে কোটি কোটি নক্ষত্র জগৎ আছে। তাঁদের আবার জন্ম ও মৃত্যু আছে। তারই একটার সূর্য বন্ধনে বাঁধা আমাদের এই পৃথিবী। সেই বসুন্ধরার কোলে বসে এক জীবাত্মার (যা মহারাজ নামে পরিচিত) আকুলতা – অনন্তকে স্পর্শ করার ইচ্ছা শালগ্রাম শিলার মধ্য দিয়ে। বস্তুত শালগ্রাম শিলা হল অনন্তকে স্পর্শ করার এক প্রকৃতিদত্ত বিধান। এতে লেখা আছে মহাকালের নির্মম ইতিহাস। এই ইতিহাস অতি বিচিত্র এবং বিস্ময়ে পরিপূর্ণ। আমরা এখন বিরাট মহাবিষ্ণুর লীলা অনুধ্যান করব।

"এই শিলা হল ভগবান বিষ্ণু বা নারায়ণের প্রতীক। শিবের প্রতীক যেমন শিবলিঙ্গ, তেমনি বিষ্ণুর শালগ্রাম শিলা। প্রায় প্রত্যেক হিন্দু গৃবস্থের বাড়িতে শালগ্রাম শিলা কুলদেবতারূপে বিরাজ করছে।

" 'শালগ্রাম' বলতে বোঝায় বিষ্ণুমূর্তির প্রতীক বিশেষ। এটি বজ্রকীট দ্বারা চক্রযুক্ত শিলা। গণ্ডকী নদীজাত বজ্রকীটযুক্ত যে শিলা পাওয়া যায় তাকেই শালগ্রাম শিলা বলে। বজ্রকীট কী জিনিস? তা হল একপ্রকার কৃমিজাতীয় প্রাণী। এই জাতীয়

প্রাণীর জন্ম হয়েছিল আজ থেকে আঠারো কোটি বছর আগে সমুদ্রের গর্ভে। তখন হিমালয় তৈরি হয়নি। হিমালয়ের বয়স মাত্র তিন কোটি বছর। জুরাসিক যুগে এই সামুদ্রিক প্রাণীদের জন্ম হলেও তা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে শিলাতে পরিণত হতে আরও কয়েক কোটি বছর লেগেছিল।

"এই পর্বতমালায় নেপালের ওই অংশের একটি বিশেষ পর্বতগাত্র 'স্পিতি শেল' নামে পরিচিত। এই স্পিতি শেলেই অ্যামোনাইট গোষ্ঠীর পেরিসস্ফিংটসের বিভিন্ন প্রজাতীর জীবাশ্ম সমন্বিত শিলাই হল শালগ্রাম শিলা যা সাক্ষাৎ নারায়ণের প্রতীকরূপে হিন্দুদের ঘরে পূজিত হয়ে আসছে।

"পৃথিবীর একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র নেপালের দক্ষিণে উচ্চ হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত অঞ্চল থেকে গণ্ডকী নদী বয়ে আসছে। কালীগণ্ডকী বয়ে আসছে গণ্ডক পর্বত থেকে। এই গণ্ডক পর্বতের অপর নাম হল শালগ্রাম পর্বত। এই পর্বতের স্তরে স্তরে লুকিয়ে আছে শালগ্রাম শিলারূপী সেই প্রাচীন জীবাশ্মের শিলাভূত দেহ। নদীর জলের তীব্র স্রোতে ওই শিলাস্তর ক্ষয় হচ্ছে। তীব্র ঘর্ষণে পর্বতগাত্র ক্ষয়ে জলে মিশে যাচ্ছে বলে গণ্ডকীর জলের রং কালো। আর এই কালো শিলাস্তরের খাঁজে লুকিয়ে থাকা আঠারো কোটি বছর পূর্বের সামুদ্রিক জীবাশ্ম শিলারূপী হয়ে জলের স্রোতে বেরিয়ে পড়ছে এবং তা ধেয়ে আসছে গণ্ডকী নদীতে। এইভাবে শালগ্রাম পর্বত থেকে শালগ্রামী নদী যুগ যুগ ধরে শালগ্রাম শিলাকে বয়ে আনছে।

"প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিরা এইসব নানারকম শালগ্রাম শিলাগুলি নেড়েঘেঁটে দেখলেন যে–শিলাগুলির মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম–বনমালা সদৃশ্য নানা চিহ্ন বর্তমান রয়েছে।

"প্রাচীন মুনি-ঋষি এবং শাস্ত্রবেত্তারা শালগ্রাম শিলা নিয়ে বিস্ময়কর গবেষণা করে গেছেন। যার মধ্যে ৫১ প্রকার প্রধান শালগ্রাম শিলার রূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

"শালগ্রাম শিলা পূজা করলে মানুষের অশেষ কল্যাণ হয়। দুঃখ দূর হয় এবং সর্বকর্মে সিদ্ধিলাভ ঘটে। বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত এইসব শালগ্রাম শিলাই গৃহীদের ঘরে ঘরে নিত্য পূজিত হয়।

"ভগবান বিষ্ণু এই পাষাণময় শিলারূপের মধ্যে তাঁর চরণচিহ্ন মেলে ধরলেন কেন? এই কথার উত্তরে আসার আগে বলি – ভগবান বিষ্ণু এবং নারায়ণ বলতে কী বোঝায়? বিষ্ণু মানে সর্বব্যাপনশীল সত্তা। যা সর্বত্র, সমস্ত কিছুর মধ্যে, অণু-পরমাণুতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাই হল বিষ্ণু। অনন্ত নিখিল মহাবিশ্বের বিস্তারের কারণ হল বিষ্ণু। তিনি কারণসাগরে শায়িত – কিনা কোটি কোটি গ্যালাক্সির নাভিচক্রে তাঁর সত্তা বিরাজমান। বিষ্ণু হলেন মহাশক্তি। এই মহাশক্তির প্রভাবেই মহাব্রহ্মাণ্ড তৈরি হয়, স্থিতি লাভ করে এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কাজেই মহাব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি জিনিসের অন্তর্যামীস্বরূপ হলেন ভগবান বিষ্ণু– যিনি জগতের সমস্ত অণু-পরমাণুতে সদা বিরাজিত, যিনি জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও নাশ এই ষড়্‌বিকারের অধীশ্বর হয়েও স্ব-স্বরূপে সর্বদা সচ্চিদানন্দময়– অজর, অমর, পরমাত্মা।

"তাঁর অপার করুণাধারা পৃথিবীলোকের গণ্ডকী নদীধারার মধ্যে কীভাবে বর্ষিত হল? এর মধ্যে রয়েছে পুরাণ কাহিনীর নানা ব্যঞ্জনা ও গল্পগাথা।

"একদা সর্বাঙ্গসুন্দর ভগবান বিষ্ণুকে পূর্ণরূপে পাওয়ার আশায় লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গার মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেল। তিনজনের ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে নিজেকে হারিয়ে সরস্বতী বোন লক্ষ্মীকে অভিশাপ দিয়ে বললেন– ওরে লক্ষ্মী তুই পৃথিবীর মাটিতে গাছ হয়ে জন্মাগে। লক্ষ্মী কোমল প্রকৃতির এবং স্বভাব নম্র। তিনি অভিশাপ শুনেই কেঁদে ফেললেন। এতে স্বভাবসুন্দর প্রেমিকপুরুষ বিষ্ণু লক্ষ্মীর চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন– দেবী, অভিশাপের কাল পূর্ণ হলেই তুমি আবার আমার বক্ষবিলাসিনী হয়েই থাকবে। তুমি পৃথিবীতে প্রথম মানুষী হয়ে জন্মাবে, তারপর পরিণত হবে গাছে।

"বাগদেবীর অভিশাপে যথাসময়ে লক্ষ্মীদেবী রাজা ধর্মধ্বজের মেয়ে তুলসীরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। যৌবনে তুলসী শঙ্খচূড় অসুরের পত্নী হন। শঙ্খচূড় ছিলেন দেবতাদের কাছে বিভীষিকাময় এবং ভয়ংকর ত্রাস। তিনি ভগবান ব্রহ্মার বরে অমর ছিলেন সত্য, তবে তাঁর স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করে দিলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন বলেও বরে একটি কথা ছিল। তা যখন শঙ্খচূড়ের তীব্র অত্যাচারে দেবতাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল তখন স্বয়ং নারায়ণ শিবকে শঙ্খচূড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। আর নিজে শঙ্খচূড়ের রূপ ধরে গিয়ে তুলসীর সতীত্ব নাশ করে দিলেন। এতে অসুরপত্নী তুলসী ক্রমশ সব অবগত হয়ে ভয়ংকর রেগে গিয়ে আগের জন্মের স্বামী স্বয়ং বিষ্ণুকেই অভিশাপ দিয়ে বলে উঠলেন– এই মিথ্যা ছলনা ও পাপাচারের জন্য তুমি পৃথিবীর মাটিতে পাষাণ হয়ে যাও।

"সেই থেকেই নারায়ণ শিলারূপে গণ্ডকীর গর্ভে অবস্থান করলেন এবং তুলসীপত্র সর্বদা শিলাযুক্ত হয়ে অমর প্রেমের সাক্ষাৎ বহন করতে লাগলেন।

"আমাদের বিভিন্ন পুরাণে শাস্ত্রকারেরা লিখেছেন– ভগবান বিষ্ণু নাকি বলেছেন– নারায়ণ শিলায় রয়েছে আমারই অংশ। আমিই শালগ্রাম শিলারূপে জন্মেছি। আর যে তুলসীপাতাকে শালগ্রাম শিলা থেকে বিচ্ছিন্ন করবে তাকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে স্ত্রী বিচ্ছেদের বিরহযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

"আজকাল বিজ্ঞানও বলছে জগতের যেকোনও সৃষ্টির মধ্যেই অদৃশ্যভাবে সৃষ্টিকর্তার ছাপ সূক্ষ্মতমভাবে লুকিয়ে রয়েছে। কাজেই সৃষ্টি কখনও স্রষ্টা থেকে দূরে থাকতে পারে না।

"শাস্ত্রগ্রন্থে লেখা আছে জগৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে বা প্রলয়কালে বিরাট কারণসমুদ্রে ভগবান বিষ্ণু অনন্ত নাগকে শয্যারূপে বিস্তৃত করে যোগনিদ্রায় নিমগ্ন হলেন।

"জলের কারণ কী? হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাস এবং বিদ্যুৎশক্তির সংযোগ। মহাবিস্ফোরণের পূর্বে জগৎ সৃষ্টির আদিকণার বেশিরভাগই হল হাইড্রোজেন গ্যাস, কার্বন, হিলিয়াম, নাইট্রোজেন প্রভৃতি। হাইড্রোজেন ও আরও পরে অক্সিজেনের অণুর অস্তিত্বেই সর্বব্যাপনশীল বিষ্ণু বিরাজ করছেন। তাছাড়া বিস্ফোরণের পর সমস্ত গ্যালাক্সির কেন্দ্রবিন্দু বা নাভিদেশ থাকে কুণ্ডলীকৃত– যা বিষ্ণুর নাভিদেশ এবং কারণ-সাগর হল আদি মৌলিক পদার্থ– আর উপরের অগণিত মেঘরাশিকে অনন্তনাগ বলে কল্পনা করা হয়েছে। তারপর মহাজাগতিক বিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী–তাঁর সামুদ্রিক জলরাশি এবং সেই জলরাশির অণু-পরমাণুর মধ্যেও বিষ্ণুর সত্তা।

"ভগবান সত্যনারায়ণ কলা, গুড়, আটা ও দুধের ভক্ত।

"শালগ্রাম শিলা পূজায় ভক্তের পুত্র, পৌত্রলাভ হয়। গৃহে স্বর্গসুখ বিরাজ করে এবং মরণকালে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে।

"এই বনমালা হল অ্যামোনাইট গোষ্ঠীর পেরিসস্ফিংটস প্রাণীদের কুণ্ডলী পাকানো খোলক। এর খোলকগুলির গাত্র অপূর্ব ও অলংকরণপূর্ণ। জীবাশ্মের খোলকগুলির এই অলংকরণপূর্ণ বনমালা তখনই দেখা যায়– যখন জীবাশ্মের উপরকার শিলা আবরণ প্রাণীদের খোলকসুদ্ধ খসে যায়। একমাত্র সেই সময়েই জীবাশ্ম সংযুক্ত শিলাতেই বনমালা সংযুক্ত হয়। এই বনমালা সব শিলাতে আছে, তবে কোনওটাতে দেখা যায় এবং কোনওটাতে অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রশ্ন হল– সমুদ্রগর্ভ বজ্রকীট কীভাবে জীবাশ্ম বা ফসিল হল? এটা একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। বজ্রকীট বা কৃমিজাতীয় প্রাণীরা মরে গেলে তাদের মাংস পচে নষ্ট হয়ে যায় এবং খোলকটা কোটি বছর ধরে মাটির নিচে পড়ে শিলায় রূপান্তরিত হয়। প্রথমে জৈব পদার্থে, পরে অজৈব পদার্থে এবং শেষে শিলায়। জীবের এই প্রস্তরীভূত রূপ হল জীবাশ্ম বা বজ্রকীট ফসিল– যা শালগ্রাম শিলারূপে সমুদ্রগর্ভে সৃষ্টি হয়েছিল। পরে হিমালয় মাথা তুললে পর্বতের দেহগাত্র উঠে আসে। আর এটা হয়েছিল পৃথিবীতে মনুষ্য বসবাসের বহু পূর্বে। তাহলে দেখা যাচ্ছে শালগ্রাম শিলা তৈরি হয়েছে পৃথিবী গ্রহে মনুষ্য আসার অন্তত ৩০ কোটি বছর আগে।

"এই শালগ্রাম জীবাশ্ম গণ্ডকী ছাড়াও মেঘালয়ের খাসি পাহাড়ে, নর্মদা উপত্যাকায়, দক্ষিণ ভারতে পণ্ডিচেরী আর ত্রিচিনপল্লিতে (অ্যামোনাইট জীবাশ্ম) পাওয়া যায় তবে বিভিন্ন কারণে এইসব অঞ্চলের শিলাগুলি শালগ্রাম রূপে স্বীকৃত হতে পারেনি।

শালগ্রাম শিলা আসলে কী?

রচনাটি পড়ে তারিফ না করে উপায় নেই। ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের এমন সুন্দর মিশেল তৈরি করা সাধারণ মানুষের কাজ নয়, সাংঘাতিক ধূর্তের কাজ। এই কারণেই এইসব সাধুরা রাজনেতা এবং পুঁজিপতিশ্রেণী বা এককথায় শাসকশ্রেণী দ্বারা পূজিত হয়। তবে বিজ্ঞান নিয়ে পণ্ডিতিপণা করতে গিয়ে স্বামীজী মহারাজ অজ্ঞানতাবশে বহু ভুল করে গেছেন। এর জন্য তাঁর প্রভু তাঁকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করে দেবেন! যাইহোক, স্বামীজী মহারাজের এই ধূর্তামি এবং অপবিজ্ঞানের খোলসকে ঝেড়ে ফেলতে হলে প্রথমে আমাদের 'শালগ্রাম শিলা' নামের এই ফসিল বা জীবাশ্মের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

হিন্দুধর্মের প্রবক্তারা যাকে ভগবান বিষ্ণুর প্রতীক শালগ্রাম শিলা বলছেন তা হল একপ্রকার সামুদ্রিক জীবাশ্ম – মোলাস্কা বা শামুক জাতীয় প্রাণী (পর্ব - মোলাস্কা, শ্রেণী - সেফালোপোডা)। এই গোষ্ঠীর প্রাণীরা (উপশ্রেণী - অ্যামোনয়ডিয়া) পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে (ক্রিটেসিয়াস যুগে)। বর্তমানে এই শামুক জাতীয় প্রাণীর অন্যান্য শ্রেণীর (ক্লাস) বিভিন্ন উপশ্রেণী (সাবক্লাস) বেঁচে আছে। যেমন নটিলয়ডিয়া (উপশ্রেণী), কোয়েলয়ডি উপশ্রেণীর অক্টোপাস, সেপিয়া প্রভৃতি। এই শ্রেণীর প্রাণীরা সমুদ্রে সাঁতার কেটে বেড়াত এবং জীবিতরা আজও তাই করে। এদের মস্তিষ্ক আছে যা সকল অমেরুদন্ডীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিকশিত। এই সেফালোপোডা শ্রেণী চলন অনুসারে তারা মাথাকেই ব্যবহার করে বলে তাদের এই নাম। এই সেফালোপোডা শ্রেণীর সামুদ্রিক প্রাণীরা আজ থেকে প্রায় ৪১ কোটি বছর আগে (ডেভোনিয়ান যুগে) প্রাণের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে। এদের মধ্যে অ্যামোনয়ডিয়া উপশ্রেণীর প্রাণীরা ক্রিটেসিয়াস যুগে অবলুপ্ত হয়েছে। সাধুসন্তরা যাকে শালগ্রাম শিলা বা নারায়ণ শিলা বলে পূজা করেন তা হল অ্যামোনয়ডিয়া উপশ্রেণীর একটি গণ (জেনাস) বিশেষ, যার নাম পেরিসফিংটিস (Perisphinctes) এই গণটি খুব অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায় (আপার জুরাসিকের ক্যালোভিয়ান থেকে টিথোনিয়ান যুগ)। এদের জন্ম হয় আজ থেকে প্রায় ১৬.৫ কোটি বছর আগে এবং তারা অবলুপ্ত হয়ে যায় আজ থেকে প্রায় ১৪.৫৬ কোটি বছর আগে। অ্যামোনয়েড উপশ্রেণীর বিভিন্ন প্রজাতির মত তুলনায় উন্নত মস্তিষ্ক হওয়ায় এরা ছিল বুদ্ধিমান। এদের চোখও ছিল তুলনায় উন্নত। এদের শরীরে একপ্রকার গ্রন্থি ছিল যার থেকে ক্রোমাটোফোর জাতীয় পিগমেন্ট ক্ষরণে শামুকটি

সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় পেরিসফিংটিস (কাল্পনিক)

শেল পাথরে প্রস্তরিভূত পেরিসফিংটিস

খোলসের রঙ পাল্টাতে পারত প্রকৃতির মধ্যে অন্যদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষার করার জন্য। এই কারণে এদের খোলস নানা বর্ণের হয়। এই প্রাণীরা ডাইমরফিক অর্থাৎ এদের পুরুষ এবং স্ত্রী ভিন্ন চেহারা ও আকারের হয়। পুরুষগুলি আকারে অতি ক্ষুদ্র (বড় অবস্থায় ১ ইঞ্চি ব্যাসের কম) এবং স্ত্রীগুলি আকারে অনেক বড় (বড় অবস্থায় ২/৩ ইঞ্চি থেকে ৬/৮ ইঞ্চি ব্যাসের)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্দিরে বা হিন্দুদের ঘরে যে শালগ্রাম বা নারায়ণ শিলা পূজিত হয় তা স্ত্রী পেরিসফিংটিস। শালগ্রাম শিলা হল পেরিসফিংটিস প্রজাতির অ্যামোনাইটের প্রস্তরীভূত রূপ। এই প্রজাতির শামুকেরা মাংসাশী। এরা কুণ্ডলী পাকানো, দ্বিপার্শ্বিক প্রতিসম, গোলাকার চাকতির মত। এদের খোলা ক্যালসিয়াম কার্বনেট (অ্যারাগোনাইট খনিজ) দিয়ে গঠিত, যা প্রস্তরীভূত হওয়ার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যায়। এদের ফসিল পাওয়া যায় অভ্যন্তরীণ ছাঁচ (internal mould) হিসাবে। খোলসের ভিতরে বিভিন্ন দেওয়াল বা সেপটা (septa) আছে এবং তার মধ্যে একটি ফুটো নিয়ে সাইফন বেড়িয়ে আসে। এর মাধ্যমে খাদ্যসহ জল যাতায়াত করে। ভেসে থেকে সাঁতার কাটাবার জন্য এরা সমুদ্রের পরিবেশ পাল্টানোর সাথে সাথে নিজেদের অভিযোজিত করবার প্রক্রিয়া চালিয়ে গেছে। অ্যামোনয়েড উপশ্রেণীর যে যে প্রজাতি তা পারেনি তারা দ্রুত বিলুপ্ত হয়েছে। সব শেষে ক্রিটেসিয়াস যুগের একেবারে শেষের দিকে ডায়নোসরসহ বিভিন্ন সামুদ্রিক ও মহাদেশীয় প্রাণীর সাথে অ্যামোনয়েড বিলুপ্ত হয়েছে। এই প্রাণীরা বিশ্বজুড়ে সমুদ্রে বিচরণ করেছে কিন্তু তাদের অনেকে পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে নিজেদের অভিযোজিত করতে না পারায় অবলুপ্ত হয়েছে। এই কারণে অ্যামোনয়েড উপশ্রেণীর প্রাণীরা (পেরিসফিংটিস সহ) খুব ভাল সময় নির্ণায়ক ফসিল (index fossil) সারা পৃথিবীর আপার জুরাসিক (ক্যালভিয়ান থেকে টিথোনিয়ান) যুগের সামুদ্রিক পাথরে পেরিসফিংটিস জীবাশ্ম পাওয়া যায়। শুধুমাত্র নেপালের গণ্ডকী (শালগ্রামী বা নারায়ণী) নদীতে নয়, হিমালয় পর্বতমালার কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ (স্পিতি বেসিন), লাদাখ, গুজরাতের কচ্ছ-কাথিয়াওয়ার অঞ্চলে এবং রাজস্থানের জয়সলমির মরুভূমিতে। অসম – মেঘালয় – তামিলনাড়ু – পন্ডিচেরী – মধ্য প্রদেশের নর্মদা উপত্যকা অঞ্চলে ক্রিটেসিয়াস যুগের অন্যান্য অ্যামোনাইট জীবাশ্ম পাওয়া যায় কিন্তু সেইসব অঞ্চলের পাথর আপার জুরাসিক থেকে নবীন হওয়ায় অর্থাৎ পেরিসফিংটিস যখন জীবিত ছিল তখন সেইসব অঞ্চলে সমুদ্র না থাকায় পাওয়া যায় না।

পেরিসফিংটিসে জীবাশ্মের গায়ে নানান রকম অলংকার (Surface ornamentation) দেখা যায়। সমুদ্রে ভেসে থাকার জন্য খোলসের ভিতরের দেওয়াল কুঞ্চিত করায় এবং খোলসের দেওয়ালের গায়ে এ ছাপ কুঞ্চিত রেখা (Ammonitic Suture) তৈরি হয়। এগুলিকে ধর্মীয় মানুষেরা বনমালা বলেন। এদের খোলসের উপর উঁচু দেওয়াল (radial costae) দেখা যায় যা পরিধির দিকে বিভাজিত, কখনও কখনও কাঁটা এবং তার ভূমিতে ছিদ্র দেখা যায়। খোলসের সামনের মুখটি প্রায় উপবৃত্তাকার এবং সমস্ত প্যাচগুলিই উন্মোচিত। প্রাণীটির বহিঃগঠনের এইসব বৈচিত্রকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ইত্যাদি কল্পনা করা হয় যেমনটা আকাশের মেঘ দেখে, রাতে আকাশের তারা দেখে মানুষ করে আসছে বহু যুগ ধরে। ঠিক একইভাবে পাহাড়ি নদীর জলের তোড়ে ভেসে আসা নুড়ি পাথর (Boulder) কে হিন্দুরা শিবলিঙ্গ হিসাবে পূজা করেন। এই নুড়ি পাথরের মধ্য দিয়ে যাওয়া সিলিকার শিরা (Silica vein) কে অনেকে আরও একধাপ এগিয়ে

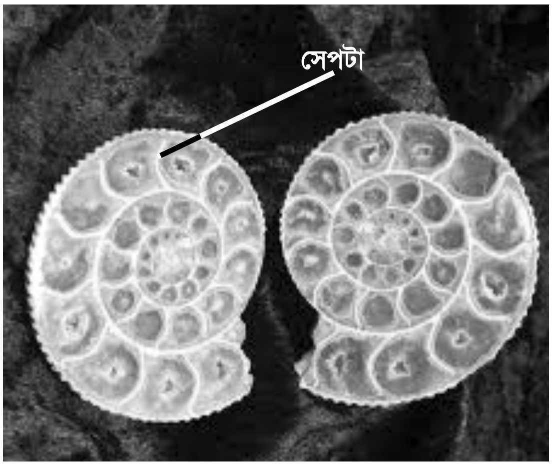

ফসিলের ভিতরের দেওয়াল (সেপটা)

অ্যামোনিটিক সুচার (বনমালা)

'শিবের গলার পৈতা'-ও বলে থাকেন। কল্পনায় কি না হয়? গরু গাছেও চড়ে!

স্বামী বেদানন্দের রচনার সারবস্তু

এবার আসা যাক সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামী বেদানন্দ লিখিত রচনা প্রসঙ্গে।

১) তিনি বলেছেন শালগ্রাম শিলার উৎপত্তি হিমালয় পর্বতে, যদিও পরে বলেছেন এই শিলা নেপালের গণ্ডকী ছাড়াও মেঘালয়ের খাসি পাহাড়ে, নর্মদা নদী উপত্যকা, দক্ষিণ ভারতের পন্ডিচেরী, ত্রিচিনোপল্লীতে পাওয়া যায়। এই তথ্য সঠিক নয়। ভারতে অ্যামোনাইট ফসিল হিমালয় পর্বতমালার (শিবালিক নয়) আপার প্যালিওজোয়িক – মেসোজোয়িক পাথরে পশ্চিম ভারতের রাজস্থানের জয়সলমির অঞ্চলে, গুজরাতের কচ্ছ-কাথিয়াওয়ার অঞ্চলে, মধ্যভারতের নর্মদা নদী উপত্যকার সামুদ্রিক ক্রিটেসিয়াস পাথরে এবং দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনোপল্লী–পন্ডিচেরির ক্রিটেসিয়াস পাথরে পাওয়া যায় কিন্তু হিন্দুরা যাকে শালগ্রাম শিলা বলছেন সেই পেরিসফংটিস হিমালয়ের কাশ্মীর, লাদাখ, হিমাচল প্রদেশের স্পিতি, নেপাল অঞ্চলে যেমন পাওয়া যায় তেমনই গুজরাতের কচ্ছ-কাথিয়াওয়ার এবং রাজস্থানের জয়সলমিরের সামুদ্রিক জুরাসিক পাথরে পাওয়া যায়। স্বামীজী ধর্মকে পান্ডিত্যপূর্ণভাবে বিজ্ঞানরূপে চালানোর ক্ষেত্রে মুন্সিয়ানা দেখালেও বিজ্ঞানটা সঠিকভাবে জেনে বলেননি।

২) উনি লিখেছেন এই শিলা হল বজ্রকীটযুক্ত এবং বজ্রকীট হল একপ্রকার কৃমিজাতীয় প্রাণী যার জন্ম হয়েছিল আজ থেকে প্রায় আঠারো কোটি বছর আগে।

বজ্রকীট নামে কোন প্রাণীর কথা বিজ্ঞানে নেই। এই কীটের কথা পাওয়া যায় হিন্দু উপাখ্যান মহাভারতে। সেখানে কর্ণকে এই কীট দংশন করেছিল যখন তিনি পরশুরামের কোলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এই প্রসঙ্গে সকলের জানা দরকার যে পেরিসফিংটিস বা অ্যামোনয়েড কৃমিজাতীয় বা অ্যানেলিডা পর্বের প্রাণী নয়, শামুক জাতীয় সেফালোপোডা পর্বের প্রাণী এবং অ্যামোনয়েড উপশ্রেণীর জন্ম হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ১৮ নয় ৪১ কোটি বছর আগে ডেভোনিয়ান যুগে এবং পেরিসফিংটিসের জন্ম হয়েছিল ১৬.৫ কোটি বছর আগে আপার জুরাসিকের ক্যালোভিয়ান সময়ে।

৩) বেদানন্দজী বলেছেন যে "নদীর জলের তীব্র স্রোতে ওই শিলাস্তর ক্ষয় হচ্ছে। তীব্র ঘর্ষণে পবর্তগাত্র ক্ষয়ে জলে মিশে যাচ্ছে বলে গণ্ডকীর জলের রঙ কালো।" এখানেও অবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে চালাতে গিয়ে তিনি অপবিজ্ঞানের প্রচার করলেন। আমরা জানি যে জল বর্ণহীন। অন্য রঙ তাতে দ্রবীভূত হলে জলের রঙ ভিন্ন হতে পারে। গণ্ডকী নদীতে জলের তীব্র ঘর্ষণে কালো শেল ও শ্লেট পাথর ভেঙে গুঁড়ো হয় কিন্তু তা দ্রবীভূত হয় না। জলে মধ্যে সাসপেনডেড অবস্থায় থাকে এবং গুঁড়ো পদার্থ হিসাবে থাকে। আসলে নিকষ কালো শেল বা শ্লেট পাথরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ায় জলের রঙ উপর থেকে কালো মনে হয়। আজলা ভরে তা উত্তোলন করলেই বোঝা যায় তা বর্ণহীন।

এই প্রসঙ্গে আরও বলা দরকার যে কাশ্মীর, স্পিতি, লাদাখ, সংলগ্ন নেপাল (হিমালয় পর্বতমালার অংশ) থেকে নেমে আসা হাজার হাজার নদী এবং হিমবাহগুলির ক্ষয়কার্যের সময় পর্বতগাত্রের মধ্যে সঞ্চিত জীবাশ্মগুলি নীচে নেমে আসে। গণ্ডকী নদীর মাহাত্ম প্রচারটাই বেদানন্দজীর উদ্দেশ্য হওয়ায় তিনি সচেতনভাবে আংশিক সত্য বলেছেন।

৪) শালগ্রাম শিলার বনমালা আসলে কি (অ্যামোনিটিক সুচার) তা আগেই বলা হয়েছে এবং তাকে যে যা খুশি কল্পনা

করতে পারেন। তবে তাকে বিজ্ঞান বলে চালানোর চেষ্টা এবং মানুষকে সচেতনভাবে অন্ধকারে রাখার চেষ্টা ঘৃণ্য।

৫) 'শালগ্রাম শিলার পূজা করলে মানুষের অশেষ কল্যাণ হয়'– এই বক্তব্য বিশ্বাসজাত। তবে ইঁদুর, বাঁদর, পেঁচা, হাতি, ঘোড়ার মত প্রাচীন শামুকের ফসিল পূজা, পাথর, গাছ, নদী পূজা প্রাচীনকাল থেকে প্রকৃতির নিয়ম না জানা মানুষ করে এসেছে। বিজ্ঞান এইসব অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে বহু মাইল পথ পার হয় এসেছে। কিন্তু এইসব প্রাচীন প্রথাকে স্বীকৃতি দিতে বিজ্ঞানের ছলনা পচামাল বাজারে রঙচঙ করে বেচার সামিল।

৬) স্বামীজী তাঁর রচনায় লিখেছেন ভগবান সত্যনারায়ণ কলা, গুড়, আটা ও দুধের ভক্ত। আর বেচারা পেরিসফিংটিস সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে কোথায় পাবে কলা, কোথায় পাবে দুধ, তাই সে সমুদ্রে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীদের ধরেই খেত। তখন তার জানা ছিল না পরে মানুষের হাত ধরে সৃষ্টিকর্তা তার দেহে স্থান নেবে, না হলে নিশ্চয়ই সে মাংসাশী হত না!

৭) বেদানন্দজীরা জানেন কি, যে শিলাগুলি হিন্দুরা সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণুরূপে পূজা করছেন সেগুলির অধিকাংশই স্ত্রী পেরিসফিংটিস? অজ্ঞ ধর্মতত্ত্ব দিয়ে তা জানা সম্ভব নয়। এর জন্য বিজ্ঞান জানা দরকার। এই নারায়ণের গায়ে লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক তুলসিপাতা চাপিয়ে অমর প্রেমের গল্প তো তাহলে সমকামিতার পক্ষ অবলম্বন করা। ধর্মবাদীরা কি এরপর শালগ্রাম শিলা পূজা থেকে বিরত হবেন?

৮) ভগবান বি ষ্ণুর এবং নারায়ণের বর্ণনা, মাহাত্ম বর্ণনা করতে বেদানন্দজী প্রাচীন বস্তাপচা ধর্মতত্ত্ব আউড়েছেন তবে আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অত্যন্ত চাতুরিপূর্ণ ভাষায়। তিনি বলেছেন 'বিষ্ণু হলেন মহাশক্তি এবং এই মহাশক্তির প্রভাবেই মহাব্রহ্মান্ড তৈরি হয়। স্থিতি লাভ করে এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয়।' আবার অন্য জায়গায় বেদানন্দজী বলেছেন 'আজকাল বিজ্ঞানও বলছে জগতের যে কোন সৃষ্টির মধ্যেই অদৃশ্যভাবে সৃষ্টিকর্তার ছাপ সূক্ষ্মতমভাবে লুকিয়ে রয়েছে। কাজেই সৃষ্টি কখনও স্রষ্টা থেকে দূরে থাকতে পারে না।'

বিজ্ঞান এরকম কোন মহাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না, ফলত ধর্মবাদীদের বিষ্ণু ঈশ্বর, আল্লাহ'কেও স্বীকার করে না। বেদানন্দজীর মহাশক্তির ধারণা প্রতিটি ধর্মমতে মূলভিত্তি যা বস্ত বাদীরা বহু পূর্বেই খারিজ করে দিয়েছে। এটা পণ্ডিত বেদানন্দজীর অজানা নয়। কিন্তু সব জেনেও তিনি ধর্মতত্ত্বকে বিজ্ঞান দ্বারা মান্যতা দিতে চেয়েছেন। বেদানন্দজী কোন্ বৈজ্ঞানিক রচনায় এইসব পেয়েছেন? গবেষণাগারে হিগস বোসন কণার আবিষ্কার ঈশ্বরতত্ত্বের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিয়েছে অথচ ঈশ্বরবাদীরা নাস্তিক পিটার হিগস্ এর আবিস্কৃত কণাকে দিব্যি 'ঈশ্বর কণা' বলে চালিয়ে যাচ্ছেন।

৯) ভগবান বিষ্ণু মানে যদি হয় সর্বব্যাপনশীল সত্ত্বা, সমস্ত কিছুর অণু-পরমাণুতেই যদি তিনি ব্যাপ্ত হয়ে আছেন তবে বিশেষ করে গণ্ডকী নদীজাত কালো, অখন্ড পেরিসফিংটিসই একমাত্র বিষ্ণুর প্রতীক নারায়ণ শিলা কেন হবেন? একমাত্র তাকে পূজা করলেই ভক্তের পুত্র, পৌত্র লাভ কেন হবে? গৃহে স্বর্গসুখ বিরাজ করবে এবং মরণকালে মোক্ষপ্রাপ্তি কেন হবে? ভাঙা চোরা, সব লক্ষণহীন, কালো নয় এমন পেরিসফিংটিস পূজা করলে নয় কেন? আর স্বামীজিও কি কণ্যা বা পৌত্রির জন্মকে লোকসান মনে করেন? ধর্মবাদ যে পিতৃতন্ত্রের রক্ষক নারী পুরুষের সমানতার বিরোধী তা এই রচনার ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত।

১০) নারায়ণ বা বিষ্ণু এবং শালগ্রাম শিলার মাহাত্ম্য প্রচার করতে বেদানন্দজী যে পৌরাণিক কাহিনীর প্রচার করেছেন, লক্ষ্মী–নারায়ণের যে অমর প্রেমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর কোন অবস্থানের পক্ষে তারা তা স্পষ্ট হয়। অন্যের স্ত্রী-র সতীত্ব নাশকে নারায়ণের মাহাত্ম বলবেন? এই কি সমাজের আদর্শ পূজনীয় চরিত্র? এই ধর্ষিতা তুলসীকে নারায়ণ শিলা থেকে বিচ্ছিন্ন করলে জন্মজন্মান্তর ধরে স্ত্রী বিচ্ছেদের বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে? পাঠকরাই ভেবে দেখবেন।

১১) স্বামীজী লিখেছেন 'মহাবিস্ফোরণের পূর্বে জগৎসৃষ্টির..... সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী। পাঠকরা কি এই কথাগুলির মধ্যে বিজ্ঞানের কিছু খুঁজে পেলেন? সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক টুকরো টুকরো কথা বলে চমক দিয়ে ধর্মতত্ত্বের উপর বৈজ্ঞানিক লেভেল চাপাতে চেয়েছেন বেদানন্দজী। সত্য ভাল, মিথ্যা খারাপ। কিন্তু অর্ধসত্য মিথ্যার চেয়েও বিপজ্জনক। বেদানন্দজী চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ করতে চেয়েছেন। বিজ্ঞান মনস্ক যে কোন সাধারণ মানুষ এই ফাঁকি ধরে ফেলবেন।

সব শেষে বলা দরকার, যে পত্রিকা 'ভগবান ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না' সেই পত্রিকায় নিয়মিত এই প্রকৃতির রচনা প্রকাশিত হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে। শুধু এই পত্রিকা নয় অন্যান্য সব পত্রিকায়, টেলি মিডিয়া, রেডিও, গল্প-সিনেমা-নাটক-সিরিয়ালে প্রতি মুহূর্তে এই ধরণের প্রয়াস জারী আছে। বিজ্ঞান মনস্ক মানুষকে এইসব ধূর্তামির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া দরকার। এই রচনা তার এক ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। ■

পাঠকের কলম ঃ

জলবায়ুর পরিবর্তন জলচক্রের দ্বারাই প্রধানভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড দ্বারা নয় !

– এনথনি ওয়াটস্

[এই রচনাটি নাসা-র ওয়েব সাইট (www.nasa.gov/topics/earth/features/vaper-warming.html)-এ ৭ই অক্টোবর ২০১৩ সালে প্রকাশ করে। রচনাটি তার আগে ওয়াশিংটন টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিশ্ব উষ্ণায়ণ প্রসঙ্গে সমীক্ষণে চলা বির্তকের রচনা হিসেবে পাঠক রঞ্জিত সমাদ্দার পত্রিকা দপ্তরে এটি পাঠিয়াছেন। গুরুত্ব অনুভব করে রচনাটির বঙ্গানুবাদ করে ছাপান হল – সম্পাদকমন্ডলী, সমীক্ষণ।]

জলবায়ু বিজ্ঞানীরা কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে পূর্ব নির্ধারিত ধারণা নিয়ে বসে আছেন। সাম্প্রতিক প্রকাশিত পঞ্চম অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে ইন্টার গভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেটিক চেঞ্জ (আইপিসিসি) দাবী করেছে যে মানুষের দ্বারা সাংঘাতিক হারে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইডই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রধানভাবে দায়ী। কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে খরা, বণ্যা, ঘূর্ণিঝড় বৃদ্ধির কারণ হিসেবে, সমুদ্রের অম্লমাত্রা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে এবং মেরু অঞ্চলের ভাল্লুকদের বেঁচে থাকার সমস্যার জন্য সমস্ত ক্ষেত্রেই একমাত্র কারণ হিসেবে দায়ী করা হচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর জলবায়ু কার্বন-ডাই-অক্সাইড নয় জলের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

পৃথিবীতে জলচক্রের মধ্যেই সমুদ্রের নোনা জল, নদী এবং হ্রদের মিষ্টি জল, সুউচ্চ পাহাড় এবং মেরু অঞ্চলের বরফের চাদর এবং হিমবাহগুলি পড়ে। সমুদ্র, বায়ুমন্ডল, মহাদেশে জলের বাষ্পীভবন, বৃষ্টি, ঝড় এবং জলবায়ুর মধ্যে চক্রাকার গতিপথকেই জলচক্র বলা হয়। এই জলচক্রে প্রচন্ড শক্তিপ্রবাহের জন্যই পৃথিবীর জলবায়ু, তাপমাত্রা পরিবর্তন এবং মহাদেশ ও সমুদ্র অভ্যন্তরের শিলাস্তরের ও তার গঠনের পরিবর্তন হয়। প্রচারের দ্বারা ভীতি সৃষ্টিকারী কার্বন-ডাই-অক্সাইডের তুলনায় পৃথিবীর এই নিরন্তর পরিবর্তনের জন্য জলের ভূমিকা বহুগুণ বেশি।

নিরক্ষরেখা অঞ্চলে সূর্যের কিরণ পৃথিবীর উপর সরাসরি পড়ে এবং সেখানে অনেক বেশি সৌরশক্তি শোষিত হয়। অন্যদিকে মেরু অঞ্চলে সূর্যের কিরণ সরাসরি না পড়ায় অনেক কম সৌরশক্তি শোষিত হয়। পৃথিবীর সর্বত্র মেরু অঞ্চল থেকে নিরক্ষরেখা অঞ্চলে তাপের বিন্যাসের দ্বারা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। মাটির উপরীতল দিয়ে বয়ে চলা বাতাস, ঝড়ের সম্মুখভাগ, সাইক্লোন, সমুদ্রের কারেন্টসহ পৃথিবীর জলচক্র নিরক্ষরেখা থেকে মেরু অঞ্চলে তাপের সঞ্চালন করে।

প্রশান্ত মহাসাগর হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল (surface feature) যা পৃথিবীপৃষ্ঠের একের তিন অংশ দখল করে আছে তা পৃথিবীর স্থলভাগের সমান। পৃথিবীর সমুদ্রে বায়ুমন্ডলের ২৫০ গুণ ভর এবং ১০০ গুণ তাপশক্তি ধারণ করতে পারে। পৃথিবীর জলবায়ুর উপর সমুদ্রের প্রভাব অসম্ভব শক্তিশালী যা এখনও জানাবোঝা যায় নি।

এমনকি গ্রীণহাউস এফেক্টের জন্য জলই প্রধানভাবে দায়ী। পৃথিবীতে ঘটা গ্রীণহাউস এফেক্টের জন্য জলীয় বাষ্প এবং মেঘ ৭৫-৯০ শতাংশই দায়ী।

আই পি সি সি এবং আজকালকার জলবায়ুর মডেল প্রস্তুতকারী “মাছির তাড়ায় কুকুরের ছোটাছুটি”-র (flea wags the dog) মডেল প্রচার করছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই ‘মাছি’ হল কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং ‘কুকুর’ হল জলচক্র। মনুষ্যজনিত উষ্ণায়ণের প্রবক্তাদের মতে বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্পের পজিটিভ ফিটব্যাক মনুষ্যজনিত কারণে নির্গত গ্রীণহাউস গ্যাস (কার্বন-ডাই-অক্সাইড)-এর জন্য হচ্ছে।

এদের যুক্তি হল যেহেতু উষ্ণ বায়ু অধিক জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে, বায়ুমন্ডলের জলীয় বাষ্প উষ্ণতাবৃদ্ধির জন্য বেড়ে যায়, যেহেতু জলীয় বাষ্প নিজেও একটি গ্রীণহাউস গ্যাস তাই অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প অতিরিক্ত উষ্ণতার জন্য দায়ী হয় যার কারণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এই তত্ত্ব অনুসারে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্যক্ষেত্রে তার চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী জলচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কিন্তু বিগত ১৫ বছরে, পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বায়ুমন্ডলে

কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রাবৃদ্ধি সত্ত্বেও বাড়তে পারে নি। সকল জলবায়ুর মডেল পৃথিবীর তাপমাত্রা উচ্চহারে বৃদ্ধির ভবিষ্যৎবাণী করেছিল কিন্তু বাস্তবে মাপা তাপমাত্রার রেকর্ড তার চেয়ে ভিন্ন। বর্তমানে এই জলবায়ুর মডেলগুলি একটা মরশুমের জলবায়ুর অবস্থারও ভবিষ্যৎবাণী মেলাতে পারছে না, দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু পরিবর্তনের হারের কথা তো দূর।

আটলান্টিক মহাসাগরের হারিকেন (বড় সমুদ্র ঝড়)-এর ভবিষ্যৎবাণীর কথাই ধরা যাক। মে মাসে ন্যাশনাল ওসেনিক এন্ড অ্যাটমস্ফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এন ও এ এ) ২০১৩ সালের সক্রিয় এবং অতিসক্রিয় হারিকেন ঝড়ের পূর্বাভাস করেছিল। সেই সময় এন ও এ এ ভবিষ্যৎবাণী করেছিল ৭ থেকে ১১ টি আটলান্টিক হারিকেন (যে সমুদ্র ঝড়ে বাতাসের গতিবেগ থাকে ঘণ্টায় ৭৪ মাইল বা তার বেশি) ঝড়ের পূর্বাভাস করেছিল। অগাস্ট মাসে এন ও এ এ সেই ভবিষ্যৎবাণী পরিবর্তন করে তার সংখ্যা কমিয়ে এনে বলল ৬ থেকে ৯ টি হারিকেনের কথা। আমরা অক্টোবর মাসে পৌঁছে গেলাম এবং দেখলাম মাত্র ২টি হারিকেন ঝড়। কম্পিউটার মডেলগুলি পৃথিবীর জলচক্রের প্রভাব কোন একটি অঞ্চলে একটি মরশুমের জন্য নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হয়নি। আই পি সি সি মনুষ্যজনিত বিশ্ব উষ্ণায়ণের প্রবক্তারা তাদের বিশ্বের উষ্ণতাবৃদ্ধির তত্ত্বকেই বোল্ড আউট করে দিয়েছে কারণ বিগত ১৫ বছর পৃথিবীপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বাড়ে নি। ডঃ কেভিন ট্রেনবার্থ বিপদে পড়ে বলেন যে মনুষ্য নির্গত গ্রীণহাইস গ্যাসের জন্য সৃষ্ট তাপশক্তি গভীর সমুদ্রে চলে গেছে। তাই যদি হয়, তবে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমুদ্রের ভূমিকাইতো মেনে নেওয়া হয়। অন্যরা আবার ১৯৯৮ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে 'লা নিনা'-র ব্যাপকতার কথা তুলে ধরছেন। ১৯৭৫-১৯৯৮ পর্যায়কালে যখন সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয়েছিল তখন প্রশান্ত মহাসাগরে উষ্ণ 'এল নিনো'-র প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল শীতল 'লা নিনা'-র তুলনায়। কিন্তু প্যাসিফিক ডেকাহাল অসসিলেশন, যা উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের একটি শক্তিশালী তাপমাত্রার চক্র শীতল পর্যায়ে (Coolphase) চলে আসে আজ থেকে ১০ বছর আগে। এই পিডিও যখন শীতল পর্যায়ে চলে আসল তখন সমুদ্রে আমরা 'লা নিনা'-র অবস্থা বেশি প্রত্যক্ষ করলাম। হয়ত এখন সমুদ্রে অধিক 'লা নিনা'-র কারণ বিশ্বের উষ্ণতা বর্তমানে একই রকম থাকা (recent flat global temperatures) কিন্তু এটাই যদি সত্য হয় তবে এটা কি প্রমাণ হয় না যে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমুদ্র এবং জলচক্রের ভূমিকা কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় অনেক শক্তিশালী? ■

বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধিতে কি পরিবেশ নিষ্ক্রিয় ?

– সোমদেব বসু

বিজ্ঞানীদের অনুমানই শেষ পর্যন্ত সঠিক প্রমাণিত হল। এতদিন আইপিসিসি'র নেতৃত্বে বিজ্ঞানীদের একাংশ বলে আসছিলেন মনুষ্যজনিত দহন কার্যে ও জীবাশ্ম-জ্বালানীর অত্যধিক ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ এমন বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। তাঁরা কার্বন ডাইঅক্সাইড সহ অন্যান্য গ্রীন হাউস গ্যাসগুলিকে বিষাক্ত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং ভূ-উষ্ণায়ণের জন্য ঐ গ্যাসগুলিকে দায়ী করেছেন। আর ঐ গ্যাসগুলি যেহেতু প্রধানত মনুষ্যজনিত কারণেই সৃষ্টি হয়, তাই ভূ-উষ্ণায়ণের কারণ হিসাবে তাঁরা মানব সভ্যতাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তাঁরা আরও বলেছিলেন যে মাত্রাতিরিক্ত গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার হারকে রোধ করার জন্য মানুষকেই সচেতন হতে হবে। প্রকৃতির ভূমিকাকে একেবারেই আমল দিতে চাননি ঐ বিজ্ঞানী মহল।

ইদানিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক 'জিওলজি' পত্রিকায় প্রকাশিত করেছেন যে তাঁরা একধরণের পীপিলিকার সন্ধান পেয়েছেন যারা বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসকে জৈব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'বন্দি' করে তা কার্বনেট লবণে রূপান্তরিত করে। যা বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ সামান্য হলেও হ্রাস ঘটায়। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানী রোনাল্ড ডর্ন জানাচ্ছেন পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে সাথে ঐ পিঁপড়ের সংখ্যাবৃদ্ধি-র যোগাযোগ রয়েছে।

ইতিমধ্যে ভূতাত্ত্বিকরা এটা প্রমাণ করেছেন যে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড অতিরিক্ত জমে গেলে পৃথিবীর বিশাল জলরাশি তার সক্রিয় প্রতিক্রিয়া দেখায়। অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডের একটা বিশাল অংশ জলে দ্রবীভূত হয়ে ধীরে ধীরে তা কার্বনেট লবণে পরিবর্তিত হয় ও সমুদ্রের তলদেশে

অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়া বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এই গবেষণার ফলাফল পরিবেশের নিষ্ক্রিয়তার তত্ত্বকে খারিজ করেছে। জীব ও উদ্ভিদকূলের একইরকম প্রতিক্রিয়া হয় কিনা তা এখনও গবেষণা সাপেক্ষ।

গতবছর রাশিয়ার ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের একাংশ আইপিসিসি'র বক্তব্যকে সমালোচনা করে বলেন মনুষ্য কার্যকলাপজনিত প্রভাব পরিবেশের কিছু অংশে পড়ছে তা নিশ্চয়ই তবে প্রকৃতির ক্ষমতার কাছে তা অতি নগণ্যই। মনুষ্য কার্যকলাপ জনিত ভূ-উষ্ণায়ণের তত্ত্বও যে ক্রমশ গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে এমন মন্তব্যও তাঁদের মুখে শোনা গেছে। এই তত্ত্বের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক বৃটিশ আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা আবার এক কদম এগিয়ে মন্তব্য করেছেন – আগামী বছরগুলিতে যে ভূশীতলায়ন ঘটতে চলেছে তার লক্ষণগুলি বেশ পরিষ্কার হচ্ছে। তাঁরা এমনও মন্তব্য করেছেন ভূ-উষ্ণায়ণ জনিত তথ্যগুলি ও তার প্রতিকার সংক্রান্ত যে সমাধানগুলি বিশ্বজুড়ে পরিবেশন করা হচ্ছে তা **যতটা না বৈজ্ঞানিক, তার থেকে বেশি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত**। ভূ-উষ্ণায়ণ কেবলমাত্র মনুষ্যজনিত তা প্রমাণ করার জন্য তথ্যাবলী গড়াপেটা করার অভিযোগও উঠেছে একদল বিজ্ঞানীর বিরুদ্ধে।

যাই হোক, বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণার তথ্যগুলি থেকে সঠিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে দরকার আরও গবেষণার। শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর অভ্যাস, বিজ্ঞান সমর্থন করেনা। ■

চিঠিপত্র

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক ও সহযোগী বৃন্দ,
সমীক্ষণ
সুধী বৃন্দ,

আপনাদের প্রচারিত চতুর্থবর্ষের ১ম সংখ্যাটি পাঠ করিলাম। পত্রিকার বিষয় চয়ন "সমীক্ষণ' নাম করণের স্বার্থকতার উদ্রেক করে। প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথে জেগে ওঠা বহু অজানা প্রশ্নের বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি ও সমাধান সমাজ খুঁজে পাবে বলে আশা রাখি। যা কিনা এই ছোট পত্রিকাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য।

"পারমানবিক শক্তি কি মানব কল্যাণের অন্তরায়?" নিবন্ধটির কিছু ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একান্ত শব্দ ও চিহ্ন ব্যবহার হওয়ায় আমার মত সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতার অন্তরায় হইলেও বিষয় প্রতিস্থাপনে যথেষ্ট দাপটের পরিচয় বহন করে।

আজকের সমাজে বহুচর্চিত এবং পত্র-পত্রিকায় স্থান প্রাপ্ত একটি বিষয় 'সমকামিতা'। বিষয়টি বিচারালয়েও স্থান পাইয়াছে। শব্দটির অবলোকনে পরিলক্ষিত হয় – ইহার সৃষ্টি ও চরিতার্থতা লোক চক্ষুর অন্তরালে দুই সংখ্যায় মধ্যে সীমাবদ্ধ মানসিক বিকৃতির প্রতিফলন, (যে মানসিকতা সমাজ ব্যবস্থার উৎকর্ষতা বর্ধন করে এবং শুষ্ঠ সামাজিকতাকে বহনে সহায়তা করে তাহাই সুস্থ মানসিকতা)। তাই চার দেওয়ালের অন্তরালে সংঘঠিত ক্রিয়া কোন ভাবেই আইন বা সাধু বাক্যের দ্বারা রদ করা অসম্ভব। যাহার নিরাময় পশ্চিমি সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা বাহিত হতাশার সুষ্ঠু সমাধান ও পরিহারের মধ্যেই নিহিত বলিয়া মনে হয়।

এই প্রকার বিষয়ের বহুল প্রচার ও আলোচনা অপ্রাপ্ত বয়স্ক মনে রসনার উদ্রেক করে ও আস্বাদনের বাসনা জাগরিত করে। তাই এই ধরণের বিষয় যত কম আলোচনা করা সম্ভব ততই মঙ্গল, অন্যথায় সমাজের অগ্রগতি পশ্চাদপর হইয়া যুগের আদিতে পৌঁছাতে বিলম্ব হইবেনা।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের ন্যায় সমাজ বিজ্ঞানও আজকের স্বীকৃত বিজ্ঞান। তাই সমাজে ঘটে চলা ঘটনাগুলির যুক্তি গ্রাহ্য কারণ ও সমাধান নিবন্ধ গুলিতে বেশি করে স্থান পাইলে সমাজের উপকার হইবে বলিয়া মনে হয়।

আমার ক্ষুদ্র বিবচনা ও চিন্তার কিছু প্রতিফল লিপিবদ্ধ পরিলাম, অত্যুক্তি মার্জনা করিবেন। আপনাদের পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সংগ্রামি অভিনন্দন সহ,
১৫.০৯.২০১৪ সুনীতি চক্রবর্তী
(পাঠক ও শুভকামি) হাওড়া

সম্পাদকের উত্তর

মাননীয় সুনীতি বাবু,

আপনার প্রেরিত পত্রের প্রত্যুত্তরে পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রথমে জানাই ধন্যবাদ। পত্রিকার, চতুর্থবর্ষ-প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত দুটি নিবন্ধ সম্পর্কে আপনার মতামত সম্পাদকমন্ডলী বিবেচনা করেছে। "পারমাণবিক শক্তি কি মানব কল্যাণের অন্তরায়?" শীর্ষক নিবন্ধ প্রসঙ্গে রসায়ন বিদ্যার শব্দ, চিহ্ন, সমীকরণ

ব্যবহার না করে আরও সহজ সরল ভাবে উপস্থাপনা করার উপযুক্ত মুন্সিয়ানা সম্পাদক মন্ডলী এখনো অর্জন করতে পারে নি। এবিষয়ে আগামীতে প্রচেষ্টা থাকবে।

"মানব সমাজে সমকামিতা কি যৌন বৈচিত্র!" শীর্ষক নিবন্ধ প্রসঙ্গে সহমত প্রকাশ করেই বলছি – এই বিষয়ে বহুল প্রচার ও আলোচনার বিরোধী আমরাও – কারণ যৌন সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার সমাজ প্রগতির অন্তরায়। নিবন্ধেও এই বিষয়ে প্রচার – প্রসারের বিরোধিতা করা হয়েছে। কিন্তু যখন বিষয়টিকে "বিজ্ঞান সম্মত" তক্‌মা লাগিয়ে বিশ্বব্যাপী আইনি স্বীকৃতির দাবী ওঠে এবং কোন কোন রাষ্ট্র আইনি অধিকার দান করে – তখন কি আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি? যখন উক্ত বিষয়টির অধিকারের দাবিতে মিটিং-মিছিল-আদালতের রায় প্রচার মাধ্যমের প্রচারে সমাজের সর্বস্তরে বিতর্কের সৃষ্টি করে – তখনকি তা আর চার দেওয়ালের মধ্যে দুই সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে? নাকি চার দেওয়াল ভেঙ্গে বহুর মধ্যে কৌতুহলের উদ্রেক সৃষ্টি করে? এমতাবস্থায় কি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা উচিৎ নয় যে উক্ত বিষয়টির জীববিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন ভিত্তি আছে কিনা? যদি বিষয়টির জীববিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন সম্পর্ক না থাকে তবে তা চার দেওয়ালের বাইরে কেন, ভেতরেও নির্মূল হওয়া বাঞ্চনীয়। তা না হলে উৎস থেকেই যায়। এবিষয়ে "সমীক্ষণে" প্রকাশিত নিবন্ধে উক্ত বিষয়টি যে সামাজিক ব্যধি তা বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমেই সমাজের সাংস্কৃতিক ফলাফলগুলি পরিবর্তন হওয়া সম্ভব–নচেৎ নয়।

আপনার পত্রে উল্লেখিত হয়েছে যে, "... সমাজ বিজ্ঞানও আজকের স্বীকৃত বিজ্ঞান"। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হল বিজ্ঞানের সকল বিভাগের ভরকেন্দ্র হল সমাজ বিজ্ঞান। পত্রে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়গুলিকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা রাখা হবে।

আপনার পত্র, আরও অনেক পাঠকের মতন, 'সমীক্ষণ' পত্রিকা প্রকাশের সার্থকতা রক্ষা করেছে। আগামীতে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আবেদন রাখলাম।

'প্রায় ৭৫ বছর পর জর্জ ম্যালরী'র দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে'

সম্পাদক,

মহাশয়, সমীক্ষণের জুলাই ২০১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত "ছন্দা গায়েন এবং পর্বত অভিযান" সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

পৃষ্ঠা ১৩'তে উল্লেখ করা হয়েছে যে ওনার (জর্জ ম্যালরীর) দেহ আজও মেলেনি। কিন্তু বাস্তবে তা নয়, ব্যাপারটা এইরূপ ঃ–

দুই ব্রিটিশ পবর্তারোহী – জর্জ ম্যালরীও অ্যানড্রিউ কমিন ইরভিন (পেশায় ইঞ্জিনিয়ার) প্রথম ১৯২৪-এ মাউন্ট এভারেস্ট আরোহণ করেছেন তা প্রমাণ করতে ১৯৯৩তে ম্যালরী এন্ড ইরভিন রিসার্চ এক্সপেডিশন দল অনেক খোঁজাখুজির পর (বারোটি ফুটবল মাঠের মত জায়গায়) ম্যালরীর দেহাবশেষ খুঁজে পায় প্রায় ৭৫ বছর পর (১৯৯৩) আর খুঁজে পায় তাঁদের ব্যবহারকরা কোডাক ক্যামেরার খোলস অবধি। দুঃখের বিষয় এতসব করার পরও ব্রিটিশরা প্রমাণ করতে পারেনি যে ওঁরাই প্রথম এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন। কারণ যেটা সর্বাগ্রে দরকার সেটা হল এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার ছবি। যাই হোক ছন্দা গায়েনের মৃত্যু আমাদের কাছে গভীর কষ্টের।

পাঠকদের অবগতির জন্য পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম (উচ্চতা সহ) এবং আরোহণ সংক্রান্ত কিছু তথ্য জানালাম।

১) মাউন্ট এভারেস্ট (নেপাল, ৮৮৪৩ মিটার)
২) কে-২ (পাকিস্তান, ৮৬১১ মিটার)
৩) কাঞ্চনজঙ্ঘা (নেপাল, ৮৫৮৬ মিটার)
৪) লোটসে (নেপাল, ৮৫১৬ মিটার)
৫) মাকালু (নেপাল,৮৪৬৩ মিটার)
৬) চো-ওয়ু (নেপাল, ৮২০১ মিটার)
৭) ধৌলাগিরি (নেপাল,৮১৬৭ মিটার)
৮) মানমলু (নেপাল, ৮১৬৭ মিটার)
৯) নাঙ্গাপর্বত (পাকিস্তান, ৮১২৫ মিটার)
১০) অন্নপূর্ণা (নেপাল,৮০৯১ মিটার)।

এভারেস্ট আরোহণে –
প্রথম প্রতিবন্ধী – টম হুইটকার (১৯৯৮)
অন্ধ ব্যক্তি – এরিক ওথেহেনমার (২০০১, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র)
স্কি করে – ডাবো কারনিকার (স্লোভানিয়া, ২০০০)
বয়স্কা মহিলা – অ্যানা পেরুনাকা (২০০০)
অক্সিজেন ছাড়া – আং রীতা শেরপা (নেপাল ১০ বারের বেশি)
প্রথম বাঙালি – কমান্ডার সত্যব্রত দাম (২০০৪, নৌবাহিনী)
প্রথম বাঙালি বাঙালি – ক্যাপ্টেন শিপ্রা মজুমদার (২০০৫, আর্মি)
ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশিবার আরোহণ – কুশাং শেরপা (১৯৯০, ৯৩, ৯৬, ৯৮, ২০০৩)

সজল কুমার গুহ (শিলিগুড়ি)
১০.১১.২০১৪

নিবন্ধ ঃ

ইবোলা ভাইরাস এইচ আই ভি'র মতোই উদ্ভাবিত
একটি শক্তিশালী জীবাণু অস্ত্র

২০১৪'র ইবোলার চালচিত্র

এবছর (২০১৪) ভারতের কয়েকটি রাজ্যে যখন "এনসেফালাইটিসের প্রকোপ চলছে প্রায় সেই সময় পশ্চিম আফ্রিকার গিনি, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন ও নাইজেরিয়াতে চলেছে "ইবোলা" মহামারী। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাইবেরিয়ায় ও নাইজেরিয়ায় জরুরী অবস্থা জারি করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এই মারণ রোগের প্রকোপ ঠেকাতে দুনিয়া জুড়ে সতর্কতা জারি করে এবং কয়েক লক্ষ মার্কিন ডলার মঞ্জুর করে। হু-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২৬শে অগাস্ট পর্যন্ত এই চার দেশে নথিভুক্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৩০৬৯, যার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ১৫৫২ জনের। হু'র মতে আফ্রিকায় এই রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার একটি প্রাথমিক শর্ত হলো সেখানকার বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যকর্মী (ডাক্তার ও নার্স) – যারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের সরাসরি পরিষেবা দেয়, তাদের এই রোগ প্রতিরোধের উপযুক্ত পোশাক সরবরাহ করা হয় না। হসপিটাল থেকেই এই রোগ বেশি ছড়ায় কারণ ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ, সূঁচ প্রভৃতির অভাবের জন্য স্বাস্থ্য কর্মীরা একই সরঞ্জাম বহু রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। খবরে প্রকাশিত বহু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জল পর্যন্ত সরবরাহ করা হয় না সবসময়। আতঙ্গে লাইবেরিয়ার সমস্ত স্কুল ও রাজধানী মনরোভিয়া শহরে বেশিরভাগ স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবছরে ইবোলার প্রাদুর্ভাবে সেখানে ১২০ জনের বেশি স্বাস্থ্যকর্মী এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে – তার কারণ স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব এবং দীর্ঘক্ষণ পরিষেবার কাজে যুক্ত থাকা। সরকার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর আস্থা হারিয়ে সেখানকার সাধারণ মানুষের একাংশ মনরোভিয়ার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভাঙচুর চালায়। এর ফলে রোগীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে রোগ আরও ছড়িয়ে পড়ে। লাইবেরিয়া, গিনি, সিয়েরা লিওনে ১০,০০০ জনকে পৃথক করে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এদের জল ও খাবারের জোগান প্রায় ছিলই না। রাষ্ট্র সংঘ ২৪,০০০ লাইবেরিয়ানকে খাদ্য দেবার ব্যবস্থা করে। হু'র মতে আক্রান্তের সংখ্যা ২০,০০০-এর বেশি। অন্যান্য বহু রাষ্ট্রের মত ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী হর্ষবর্ধন ঐ সময় কোনও ভারতবাসীকে পশ্চিম আফ্রিকায় যেতে নিষেধ করেছিলেন। বৈদেশিক যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকায়, মহামারী কবলিত দেশগুলির অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আইএমএফ ঐ তিন রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়ে বিবেচনার কথা ঘোষণা করে। ৯.১০.২০১৪-এর 'এই সময়' পত্রিকায় প্রকাশিত, সিয়েরা লিওনে, সাফাই কর্মীরা সময় মত বেতন না পাওয়ায় মৃতদেহ সৎকার করা বন্ধ করে দেয়। বাড়িতে, রাস্তায় পড়ে থাকে অসংখ্য মৃতদেহ। আব্বাস তুরে নামে এক কর্মী জানায়, "বিনা বেতনে দুসপ্তাহ ধরে কাজ করে চলেছি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করব অথচ মাইনে পাব না এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।" প্রতিবেশী দেশ লাইবেরিয়াতেও স্বাস্থ্য কর্মীরা হুমকী দিয়েছেন যে এই সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের মাসিক বেতন ৭০০ ডলার না দিলে এবং সুরক্ষা কবচ না বাড়ালে, তাঁরাও ধর্মঘটের পথে হাঁটবেন। একটি অর্থনৈতিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত – ইবোলা প্রাদুর্ভাবের ফলে অর্থনৈতিক সংকটে মৃত্যুর হার, ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার অপেক্ষা অনেক বেশি। ২০১৪-এর প্রাদুর্ভাবের পরে উগান্ডার প্রেসিডেন্ট নিয়মরক্ষার্থে দেশবাসীকে সতর্ক করে বলেন "I therefore appeal to you to be vigilant. Avoid shaking of hands; do not take on burying somebody that has died from symptoms which look like Ebola. Instead call the health workers to be the ones to do it. And avoid promiscuity because this sickness can also go through sex."

আফ্রিকা ছাড়াও আমেরিকা, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেও ইবোলায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ইবোলায় আক্রান্ত হয়ে মানুষের মৃত্যুর হার ৯০% পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। আমাদের দেশে এনসেফালাইটিসের প্রকোপ চলাকালীন সময়, প্রচার মাধ্যমের দৌলতে, দেশের অনেকেই

ইবোলায় আতঙ্কিত হয়েছিলেন। এই আতঙ্কের মোকাবিলা করতে আমাদের জানা দরকার ইবোলা রোগটা কী, এই রোগের উৎস কী? এই রোগের সংক্রমণ ঘটে কিভাবে, এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী।

ইবোলা কী?

ইবোলা রোগ হলো এক প্রকার ভাইরাস ঘটিত রোগ। এই ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশের পর দুদিন থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। জ্বর, গলা ব্যাথা, গা-হাত-পা ব্যাথা, মাথার যন্ত্রণা, ক্ষুদামন্দ্য, বমি, পাতলা পায়খানা এবং গায়ে র‍্যাশ বের হয়। প্রাথমিকভাবে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, কলেরার সঙ্গে এর মিল দেখা যায়। ক্রমশ যকৃৎ ও বৃক্কের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়। রক্তবাহনালীর এপিথেলিয়াম কলাস্তর নষ্ট হয়ে যায়। ফলে দেহের ভেতরে ও বাইরে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এই রক্তক্ষরণই রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় অনেকে অন্য কোনও ভাইরাল হেমোরেজিক ফিভার হয়েছে ভেবে ভুল করেন। রক্তপরীক্ষায়, রক্তে এই ভাইরাসের অ্যান্টিবডির উপস্থিতি, কোষে ভাইরাসের উপস্থিতি বা ভাইরাসের আর এন এ'র উপস্থিতির দ্বারা রোগীর ইবোলায় আক্রান্ত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। মহামারী চলাকালীন সময় পিসিআর (Polymerase chain reaction) বা এলাইজা (Enzyme-linken immunosarbent assay) পরীক্ষা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায়।

কবে থেকে শুরু হলো ইবোলা

১৯৭৬ সালের ২৬শে অগাস্ট, গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক কঙ্গোর ইয়াম বুকু'র এক গ্রাম্য ইস্কুলের হেডমাস্টারের ইবোলায় আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রথম নথিভুক্ত হয়। ঐ ব্যক্তির রোগের যে লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছিল তা ছিল ম্যালেরিয়ার অনুরূপ। ঐ বছর ইয়াম বুকু'তে মোট ৩১৮ জন আক্রান্ত হওয়ার ও ২৮০ জনের মৃত্যু সংবাদ নথিভুক্ত আছে। এই প্রাদুর্ভাবের জন্য দায়ী ভাইরাসকে প্রথমে ভাবা হয়েছিল মারবার্গ ভাইরাস। পরে জানা যায় যে এটি নতুন ভাইরাস যা মারবার্গ ভাইরাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। কঙ্গো নদীকে ফরাসী ভাষায় উচ্চারণ করা হয় ইবোলা। আগে এর নাম ছিল জাইরে। এই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব প্রথম ঘটায়, এই ভাইরাসের নামকরণ হয় 'জাইরে ইবোলা ভাইরাস'। ঐ বছরেই সুদানে ইবোলা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই ভাইরাসটি ছিল পৃথক – সুদান প্রজাতি। ২০১০ সালে চূড়ান্তভাবে এই ভাইরাসের নামকরণ হয় 'ইবোলা ভাইরাস' এবং রোগটির নাম হয় 'ইবোলা'। কিন্তু ১৯৭৬ সালের পূর্বে এই রোগটির কোনও অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়নি।

ইবোলা ভাইরাস সংক্রমণ

ইবোলা ভাইরাস হল জেনোটিক প্যাথোজেন। এই ভাইরাস বন্যপ্রাণী থেকে প্রথমে মানুষে সংক্রামিত হয় বলে অনুমান। প্রধানত সেন্ট্রাল ও সাব সাহারান আফ্রিকায় এই ভাইরাসের মধ্যবর্তী পোষক – বিভিন্ন প্রজাতির ফ্রুটদের ব্যাট ভাবা হচ্ছে। কিন্তু বাদুরেরই প্রাকৃতিকভাবে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য প্রমাণ নেই। মানুষ ও কিছু এপ্‌স হলো শেষ পোষক। ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জে শূকর সংক্রামিত হওয়ার (রেসটন ভাইরাস) তথ্য পাওয়া গেছে। আক্রান্ত মানুষের রক্ত ও বডিফ্লুইড দ্বারা সুস্থ মানুষে এই রোগ সংক্রামিত হয়। আক্রান্ত মানুষের মল-মূত্রের সংস্পর্শে সুস্থ মানুষ এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত হওয়ার পর যেসব পুরুষ বেঁচে যায় – তাদের বীর্য্য দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা পরবর্তী তিন মাস পর্যন্ত থেকে যায়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও যেহেতু মৃতদেহ থেকে এই রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যায়, তাই ধর্মীয় মত অনুযায়ী কবর দেওয়া ইবোলা আক্রান্ত মৃতদের ক্ষেত্রে উচিত নয়। এই ভাইরাসের মারণ ক্ষমতা বিচারে হু একে 'রিস্ক গ্রুপ ফোর প্যাথোজেন'-এর তালিকাভুক্ত করেছে।

ইবোলা সংক্রমণের প্রাকৃতিক চক্র কিভাবে শুরু হয় তা পরিষ্কারভাবে বলা যায় না। প্রাকৃতিকভাবে ফ্রুট ব্যাটের ইবোলা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কোনও তথ্য প্রমাণ নেই। বায়ু বা জল দ্বারা বাহিত হয়ে সংক্রমণ ঘটানোর কোনও প্রমাণ নেই। যদিও একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে কোনও রকম সংস্পর্শ ছাড়াই এই ভাইরাস শূকর থেকে প্রাইমেটে ছড়ায়। তথাপি অন্য একটি সমীক্ষা, মানুষ নয় এই রূপ প্রাইমেটদের মধ্যে সংস্পর্শ ছাড়া সংক্রামিত হওয়ার প্রদর্শন দেখাতে ব্যর্থ হয়। ১৯৭৬ ও ১৯৭৯ সালে ইবোলার প্রাদুর্ভাব ঘটে প্রধানত বস্ত্র কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে। যে সব কারখানায় প্রচুর বাদুরের বাসা ছিল। এরপর ২৪টি প্রজাতির উদ্ভিদ ও ১৯টি প্রজাতির মেরুদন্ডী প্রাণীর মধ্যে অল্প পরিমাণে ইবোলা

ভাইরাস প্রবেশ করিয়ে দেখা যায় শুধুমাত্র বাদুরই সংক্রামিত হয়েছে। কিন্তু বাদুরের দেহে কোনও রোগ লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়ায় বাদুরকে এই ভাইরাসের পোষক রূপে গণ্য করা হয়। এই পরীক্ষা দ্বারা বলা যায় কি বাদুর ইবোলা ভাইরাসের প্রাকৃতিক পোষক? নাকি এই পদ্ধতি ছিল পোষক খোঁজার প্রচেষ্টা মাত্র !

২০০২ ও ২০০৩ সালে গ্যাবন ও কঙ্গো থেকে ৬৭৯টি বাদুর সহ মোট ১০৩০টি প্রাণীর উপর অনুসন্ধান চালিয়ে মাত্র ১৩টি ফ্রুট ব্যাট-এর মধ্যে ইবোলা ভাইরাসের আরএনএ'র অংশ পাওয়া যায়। ২০০৫ সালে Hypsignathus monstrosus, Epomops franqueti ও Myonycteric – এই তিন প্রকার ফ্রুট ব্যাট'কে চিহ্নিত করা হয় যারা ইবোলা ভাইরাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। এদেরকেই ইবোলা ভাইরাসের পোষক বলে অনুমান করা হচ্ছে। এরপর বাংলাদেশের ফ্রুট ব্যাট-এর মধ্যেও ইবোলা ভাইরাসের অ্যান্টিবডি পাওয়া গেছে বলে খবর আছে।

১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে আফ্রিকায় ইবোলা মহামারী কবলিত এলাকাগুলি থেকে ৩০,০০০ স্তন্যপায়ী, পাখি, উভচর, সরীসৃপ, পতঙ্গ'র উপর পরীক্ষা করে মাত্র ৬টি তীক্ষ্ণ দন্ত যুক্ত প্রাণী [ইঁদুর (Rodents)] এবং একটি মুষিক জাতীয় প্রাণী ব্যতীত অন্য কোনও প্রাণীর মধ্যে ইবোলা ভাইরাসের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় নি। ২০০১ ও ২০০৩ সালে প্রাদুর্ভাবের সময় গোরিলা ও শিম্পাঞ্জির মৃতদেহে ইবোলা ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

এই সকল পরিসংখ্যান ভিত্তিক গবেষণা কি ইবোলা ভাইরাসের প্রাকৃতিক চক্রকে সুনির্দিষ্ট করতে পেরেছে? নাকি ইবোলা ভাইরাসের প্রাকৃতিক অস্তিত্ব দেখাতেই ব্যর্থ হয়েছে। [তথ্যসূত্র ঃ ৩১.৭.১৪-এ 'এই সময়' পত্রিকায় প্রকাশিত 'যেভাবে ছড়ায় ইবোলা' শীর্ষক রচনা। চিত্র ঃ ২৪ পৃষ্ঠায়]

ইবোলা ভাইরাস

এই ভাইরাসের ফ্যামিলি হল Filoviridae। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেছে এই গণের (জেনাস) পাঁচটি প্রজাতির মধ্যে চারটির যে কোন একটি শরীরে প্রবেশ করলে ইবোলা রোগ সৃষ্টি হয়। রোগ সৃষ্টিকারী চারটে প্রজাতি হল – Bundibagyo virus (BDBV); Sudan virus; Tai Forest virus (TAFV); Zaire ebola virus । ইবোলা রোগ সৃষ্টিকারীদের মধ্যে জাইরে ইবোলা ভাইরাস সবচেয়ে মারাত্মক। এই ভাইরাস সংক্রমণের ফলেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ও সবচেয়ে বড় মহামারী সৃষ্টি হয়েছে। বলা হয়েছিল রেস্টন ভাইরাস মানুষের ক্ষেত্রে ইবোলা রোগ সৃষ্টি করে না। ১৯৮৯ সালে ভার্জেনিয়ায় রহস্যজনকভাবে একটি মারণ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সেই সময় ফিলিপিন্স থেকে ভার্জেনিয়ায় আমদানিকৃত বানরদের মধ্যে মৃতদের কোষ-কলা আমেরিকার আর্মি মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ ইনফেকসাস ডিজিজ-এর ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে রেস্টন ইবোলা ভাইরাস-এর উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছিল। এই ভাইরাস রেস্টন-এর macaque বানরের শরীরে পাওয়া যায়। এই কারণেই এই প্রকার ভাইরাসের নামকরণ হয় রেস্টন ইবোলা ভাইরাস। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় REBOV দ্বারা ল্যাবরেটরির কেউ আক্রান্ত হয়নি। আবার ঐ বানরগুলিকে দেখাশোনা করত যারা, তারা তখন ঐ রোগের বিষয়ে সচেতন ছিল না। এমন ১৭৮ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু মাত্র ৬ জনের মধ্যে সংক্রমণের তথ্য জানা যায়। আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) মন্তব্য করে মানুষের মধ্যে এর সংক্রমণের হার নগণ্য। আবার সিডিসি'র পক্ষ থেকে বলা হয় ইবোলা ভাইরাস যেমন জৈব নিরাপদ তেমনি আবার জৈব সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী বস্তু হয়েও উঠতে পারে। একে জীবাণু যুদ্ধের যথেষ্ট শক্তিশালী উপাদান রূপে গড়ে তোলার গবেষণা চলছে। কিন্তু ব্যাপক ধ্বংস সাধনের ক্ষেত্রে সমস্যা হলো মুক্ত বায়ুতে এই ভাইরাস দ্রুত কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

১৯৯৫ সালে কঙ্গোতে পুনরায় ইবোলা সংক্রমণ ঘটে যাতে নথিভুক্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৩১৫ জনের মধ্যে ২৫৪ জনের মৃত্যু হয়। ২০০০ সালে উগান্ডাতে নথিভুক্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৪২৫, মৃত্যু হয় ২২৪ জনের। এটি ছিল সুদান ভাইরাসের প্রকোপ। ২০০৩ সালে কঙ্গোতে নথিভুক্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১৪৩, মৃত্যু হয় ১২৮ জনের। ২০০৭ সালে পুনরায় কঙ্গোতে ১৪৯ জন আক্রান্ত হয় এবং ৩৭ জনের মৃত্যু হয়। হু'র মতে এই প্রাদুর্ভাবগুলির জন্য ইবোলা ভাইরাসের নতুন প্রজাতি Bundibagyo দায়ী। ২০১২ সালে উগান্ডাতে দুটি ছোট ছোট প্রাদুর্ভাবের জন্য হু'র ইবোলা ভাইরাসের সুদান প্রজাতিকে চিহ্নিত করে। কিন্তু ২০১২'র ১৭ই অগাস্ট কঙ্গোর স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ঐ প্রাদুর্ভাবের জন্য দায়ী ছিল Ebola-Bundibagyo variant। আবার ২০১২ সালেই শূকরের মধ্যে ইবোলা রেস্টন ভাইরাস সংক্রামিত হওয়ার

এবং কোনরকম স্পর্শ ছাড়াই শূকর থেকে মানুষ নয় এরূপ প্রাইমেটে সংক্রামিত হওয়ার খবরে প্রকাশিত হয়। ['প্রজাতি ভেদে গড় মৃত্যু হার' টেবিল ঃ ২৪ পৃষ্ঠায়]

ইবোলা রোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ

ইবোলা রোগের কোনও সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা এখনো পর্যন্ত নেই। শুধুমাত্র রোগ লক্ষণ অনুযায়ী সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়। ওরাল রিহাইড্রেশান থেরাপি অথবা ইনট্রাভেনাস ফ্লুয়িড দেওয়া হয়। এই রোগ সংক্রমণ হ্রাস করার জন্য সংক্রামিত পশু বা মানুষ থেকে সুস্থ মানুষকে পৃথক করে রাখতে হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি থাকার সময় নিরাপত্তামূলক বস্ত্র ব্যবহার করতে হয়। ইবোলায় আক্রান্ত পশুর মাংস খাওয়ার বিষয় ওই মাংস রান্নার পূর্বে প্রতিরোধমূলক বস্ত্র ও গ্লাভস ইত্যাদি ব্যবহার করে রান্নার ব্যবস্থা করতে হয়। যথেষ্ট সময় ধরে, যথেষ্ট উত্তাপে রান্না করা প্রয়োজন। আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত ও বডি ফ্লুইড সতর্কতার সঙ্গে হ্যান্ডেল করতে হয়। পূর্বে ইবোলায় আক্রান্ত রোগীকে Plastic Isolater-এ রাখা হত। বর্তমানে আরও উন্নত 'স্ট্রিক্ট ব্যারিয়ার আইসোলেশন উইথ বডি ফ্লুয়িড প্রিকশানস' পদ্ধতিতে হাসপাতাল কর্মীদের বাড়তি কোনও ঝুঁকিই থাকে না। কিন্তু মহামারী চলাকালীন সময় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা বাস্তবত অসম্ভব হয়ে পরে। কারণ হাসপাতালগুলিতে রোগী ধারণ ক্ষমতা অপেক্ষা অনেক বেশি রোগীর আগমণ ঘটে, মৃতদেহ পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দিতে হয় এবং যাদের হাসপাতালে জায়গা হয় না তাদের মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে থাকে। অর্থের অভাব ও আতঙ্ক রোগের বিস্তার ব্যাপকতম করে তোলে।

ইবোলা ভাইরাসযুক্ত বস্তুকে ৬০° সেন্ট্রিগ্রেড উষ্ণতায় ৩০ থেকে ৬০ মিনিট উত্তপ্ত করলে অথবা ৫ মিনিট ফোটালে ইবোলা ভাইরাস নিষ্ক্রিয় হয়। লিপিড দ্রাবক যেমন অ্যালকোহল বেস্‌ড প্রোডাক্ট, ডিটারজেন্ট, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট (ব্লিচ); ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট (ব্লিচিং পাউডার) প্রভৃতি (নির্দিষ্ট গাঢ়ত্বের) ব্যবহার করে এই ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করা যায়। ইবোলা সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য, আক্রান্ত ব্যক্তিকে পৃথক বা আটক করে রাখার আইন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চালু হয়েছে। হু-এর নিয়মানুসারে শূকর ও বানরের বাসস্থানগুলি নিয়মিত সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট দ্বারা পরিষ্কার করা উচিত। যদি কোথাও প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ সেই অঞ্চলকে বাকি অঞ্চল থেকে পৃথক করা প্রয়োজন।

ইবোলা রোগের ভ্যাকসিন ও ঔষধ

মানুষের ইবোলা রোগ প্রতিরোধকারী কোনও ভ্যাকসিন এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। গবেষণা চলছে। এর মধ্যে ডিএনএ ভ্যাকসিন সবচেয়ে সম্ভাবনাময়। ডিএনএ ভ্যাকসিন, অ্যাডিনো ভাইরাস বেস্‌ড ভ্যাকসিন এবং ভিএসআইভি বেস্‌ড ভ্যাকসিন-এর প্রয়োগজাত ফলাফল লক্ষ করা হচ্ছে। এই ভ্যাকসিনগুলি মানুষ নয় এমন প্রাইমেটদের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলেছে। প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠতে ৬ মাস সময় লাগে। দ্রুত প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য গবেষণা চলছে। মানুষের উপর এই ভ্যাকসিন প্রয়োগের প্রথম পদক্ষেপ ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হয়। তিন মাসে তিনটি ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে দেখা যায় কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠেছে। তবে ইবোলা ভাইরাসের যে স্ট্রেইন মানুষকে বেশি আক্রান্ত করে তার ভ্যাকসিন আবিষ্কার এখনো সম্ভব হয়নি। ইবোলায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন। এই প্রসঙ্গে হু-এর বক্তব্য হল বিভিন্ন দেশে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার অবস্থা এবং চিকিৎসার মান বিভিন্ন রকম। বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষামূলক চিকিৎসা চালানো হচ্ছে – ইবোলায় আক্রান্তদের উপর। ২০১৪-এর ১৪ই অগাস্ট পর্যন্ত এফডিএ ইবোলায় আক্রান্তদের জন্য কোনও চিকিৎসা বা প্রতিরোধের জন্য কোনও ভ্যাকসিন অনুমোদন করেনি। বরঞ্চ প্রতারণাপূর্ণ চিকিৎসার জন্য সতর্ক থাকতে বলেছে। ২০১৪-এর প্রাদুর্ভাবের সময় পরীক্ষামূলক চিকিৎসার জন্য বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে মানবিকতার খাতিরে চিকিৎসার চেষ্টা অন্য দিকে অনৈতিকভাবে অপ্রমাণিত ওষুধের ব্যবহার। মাল্টিন্যাশনাল, ট্রান্স ন্যাশনাল ওষুধ কোম্পানিগুলির নতুন ওষুধগুলির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে প্রধানভাবে আফ্রিকার মত উন্নয়নশীল দেশগুলি। **২০১৪-এর ১২ই অগাস্ট হু এক বক্তব্য পেশ করে – যাতে বলা হয় কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে অপ্রমানিত ওষুধের ব্যবহারও নৈতিক – কারণ এটা চিকিৎসা দেবার একটা প্রচেষ্টা বা রোগ প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা।**

২০১৪-এর জুলাই মাসে, ইবোলা নিরাময়ের জন্য Z Mapp নামক ওষুধ প্রথম মানুষের উপর প্রয়োগ হয়। সম্প্রতি আমেরিকা ভিত্তিক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দুই সদস্য পশ্চিম আফ্রিকার লাইবেরিয়াতে ইবোলা ভাইরাস ও ইবোলা আক্রান্তদের প্রতিষেধক বিষয়ে গোপনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

চালাতে যান এবং তাঁরা নিজেরাই ইবোলায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের বিশেষ বিমানে আমেরিকায় ফিরিয়ে আনা হয়। আটলান্টার একটি হাসপাতালে ভর্তি করে তাঁদের উপর ZMapp প্রয়োগ করা হয় সঙ্গে ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড দেওয়া হয়। এই চিকিৎসায় তাঁরা দুজন সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু ৭৫ বছরের একজন স্পেনীয় নাগরিকের ক্ষেত্রে ঐ একই ওষুধ প্রয়োগ করার পরও তিনি মারা যান। ইবোলায় আক্রান্ত লাইবেরিয়ার তিনজন স্বাস্থ্য কর্মীর উপর ZMapp এর প্রয়োগের ফলে তাদের উন্নতি ঘটে কিন্তু পরে একজন মারা যায়। একজন বৃটিশ নার্সকেও ঐ ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। তার ফলাফল প্রকাশিত নয়। এই বিষয়ে কিছু গবেষকের মতে **এবছর আক্রান্ত দের প্রায় ৪৫% মানুষ কোন চিকিৎসা ছাড়াই সুস্থ হয়ে গেছেন – শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়েই তারা লড়েছেন ইবোলার বিরুদ্ধে।** তাই ZMapp এর কার্যকারিতা সম্পর্কে এখনই পরিষ্কারভাবে কিছু বলা যায় না। কিন্তু এই ঔষধ কোম্পানি ঘোষণা করেছে যে বাজারে সরবরাহকৃত তাদের সমস্ত ঔষধ ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবে কি হু ওষুধের অপব্যবহারকে প্রশ্রয় দিয়ে মুনাফার স্বার্থ রক্ষা করল?

জাপানে Favipiravin নামক ভাইরাস সংক্রমণের জন্য ব্যবহৃত ওষুধ – যা প্রচুর পরিমাণে মজুত – যা ইনফ্লুয়েঞ্জায় ব্যবহার করা হয় – এখন তা ইঁদুরের ইবোলায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

২০১৪-এ প্রকাশিত এক গবেষণা পত্রে বলা হয়েছে যে গবেষণায় দেখা গেছে Amiodarone - যা হার্টের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় – তা জীবদেহের বাইরে (in vitro) ইবোলা ভাইরাসকে কোষে প্রবেশ করতে দেয় না।

২০১৪ সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানিগুলি ঘোষণা দিয়েছে যে, ইবোলা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ, তাদের প্রস্তুত ভ্যাকসিন পরীক্ষার কাজে তারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আগামী বছর এগুলি মানুষের মধ্যে ব্যবহারের ফলাফল জানা যাবে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ হয়ে গেছে এবং ভ্যাকসিনের মাত্রা নির্ধারণ করতে আগামী বছর ইবোলা ভাইরাস পুনরায় ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে! সংক্রমণের হার কম হলে ভ্যাকসিন সফল। আর সংক্রমণের হার বেশি হলে ZMapp তো তৈরী আছে আর সঙ্গে আছে হু।

ভ্যাকসিনই সংক্রমণের কারণ হতে পারে

১৯৭৬ সাল থেকে আজ অবধি আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইবোলা ভাইরাস সংক্রমণ বিক্ষিপ্তভাবে ঘটে চলেছে। বর্তমানে আমেরিকা ও ইউরোপে ইবোলায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। মূলস্রোতের ডাক্তারদের অনুমান ইবোলায় আক্রান্ত বানর অথবা ইবোলার পোষক বাদুরের মাংস খাওয়ায় মানুষের মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ ঘটেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো আফ্রিকার যে সব মানুষ বানর বা বাদুরের মাংস খেয়ে ইবোলায় আক্রান্ত হল **তারা তো ১৯৭৬ সালের পূর্বেও ঐ রূপ মাংস খেতে অভ্যস্ত ছিল – তখন কি ঐ বানরেরা ইবোলায় আক্রান্ত হত না, নাকি বাদুরগুলি ইবোলার পোষক ছিল না?** পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞানী মহল সুনির্দিষ্টভাবে ইবোলা ভাইরাসের প্রাকৃতিক পোষক চিহ্নিত করতে পারেনি।**ইবোলা ভাইরাসের প্রাকৃতিক আদি উৎস সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ নেই। সুতরাং এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটার বিষয়ে কি সন্দেহ থেকে যায় না?**

Cross Species Vaccine-এর সাধারণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার কারণ হ'ল এর দ্বারা প্রজাতিব্যাপি রোগ বিস্তার প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু এডওয়ার্ড জেনার বলেছিলেন – কোন জীবণু একটি প্রজাতির ক্ষেত্রে মারাত্মক না হলেও – অন্য প্রজাতির ক্ষেত্রে মারাত্মক হতে পারে। জেনার মানুষকে স্মল পক্স থেকে মুক্তি দিতে কাউ পক্স ভাইরাস (ভ্যাকসিন) ব্যবহার করেছিলেন। তিনিই ভ্যাকসিন ইনফেকশনের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন – যা গরুর ক্ষেত্রে সামান্য অসুস্থতা সৃষ্টি করে – সেটাই ঘোড়ার ক্ষেত্রে মারাত্মক অসুস্থতা সৃষ্টি করে। একই ভাবে পুরানো কোন ভাইরাস যদি নতুন প্রজাতির কোন প্রাণী দেহ থেকে মানবদেহে সংক্রামিত হয় – তবে সেক্ষেত্রে অনেক বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। জীবাণু ও রোগ লক্ষণের মধ্যে সম্পর্ক পরিষ্কার নয়। বহু রোগের ক্ষেত্রে প্রায় একই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, সাধারণভাবে আফ্রিকার বানরদের দেহে পরীক্ষামূলক ভ্যাকসিন তৈরী হয়। পরীক্ষার পর বহু বানরকে পুনরায় বনে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই অনুশীলনই সম্ভবত পশুদের মধ্যে নতুন ভাইরাস সংক্রমণের কারণ। এ থেকেও মানুষ সংক্রামিত হতে পারে। আবার মানুষের ব্যবহারের জন্য, ভ্যাকসিনের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা হয় প্রধানত আফ্রিকার গ্রাম্য মানুষের উপর। বহু গৃহপালিত পশু-পাখির উপরেও Live-Viral-Vaccine - এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা হয় – যারা মানুষের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় ক্রস স্পিসিস

ট্রান্সফার এভাবেই হয়। সদ্য অনুমতিপ্রাপ্ত ভ্যাকসিন উৎপাদনের ক্ষেত্রেও দশটির বেশি প্রজাতির প্রাণী ব্যবহার করা হয়।

রোগ সংক্রমণের ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে, এক রোগের ভ্যাকসিনের মাধ্যমে অন্য রোগের সংক্রমণ ঘটেছে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে রোগ সংক্রমণের জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত ভ্যাকসিনই দায়ী – তারও প্রমাণ রয়েছে। যেমন ইয়েলো ফিভার ভ্যাকসিনের মধ্যে অ্যাভিয়ান লিউকোসিস ভাইরাস পাওয়া গিয়েছিল, যা মুরগীর ক্ষেত্রে লিউকোমিয়া রোগের কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইয়েলো ফিভার ভ্যাকসিন হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে পূর্ণ ছিল, যা নাকি অনিচ্ছাকৃত ঘটেছিল। বর্তমানে মিজলস্, মাম্পস, রুবেলা (এম এম আর) ভ্যাকসিন এর মধ্যে মৃদু পরিমাণে reverse transcriptase উপস্থিত থাকে – যা রেট্রোভাইরাস-এর সঙ্গে সম্পর্কিত একপ্রকার এনজাইম। Salk ও Sabin polio Vaccine তৈরী করা হয় রিসেস বানরের দেহে – ফলে ঐ ভ্যাকসিনে Sv-40 নামক এক প্রকার ভাইরাস উপস্থিত থাকে। এই ভ্যাকসিন মুখছিদ্রের মধ্য দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা গ্রহণ করলে – এর মধ্যে উপস্থিত ভাইরাস মানবদেহে পাকস্থলীর মধ্যে ধ্বংস হয়।

Dr. Horowitz দেখিয়েছিলেন যে Polio Vaccine এর মাধ্যমে মানব দেহে এইচআইভি সংক্রমণ তথা এইডস হওয়া সম্ভব। ১৯৬০-এর গোড়ার দিক থেকে Polio Vaccine তৈরী করতে আফ্রিকার Manican green Monkey-এর ব্যবহার শুরু হয়। এই নতুন পোলিও ভ্যাকসিনের পক্ষে গ্রিন মাংকি'র দেহস্থ ভাইরাস বহন করা অসম্ভব নয় - যা আবার সহজে চিহ্নিত করা যায় না। এই সবুজ বানর প্রায় সময়ই সিমিয়ান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (এসআইভি) দ্বারা আক্রান্ত থাকে – এই ভাইরাস HIV-1 ভাইরাসের সঙ্গে জেনেটিক্যালি সম্পর্কিত।

সুতরাং Live - Viral Vaccine প্রয়োগ করার আগে তা অন্য ভাইরাস পূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কোন প্রাণীর দেহে Vaccine তৈরী করা হচ্ছে – যার ফলে রিকম্বিন্যান্ট মিউট্যান্ট-এর উদ্ভব ঘটছে কিনা তাও নজর রাখা দরকার। কিন্তু Live - Viral Vaccine এর মাধ্যমে অন্য ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার তত্ত্ব প্রমাণিত হওয়ার পরেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী সংস্থা প্রধানত এফডিএ – অনুমোদিত ভ্যাকসিনের পুনরায় পরীক্ষা করার বিরোধিতা করেছে। লিখিত আইনে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে – *"Since vaccine development information is considered proprietary-protected by nondisclosure policies - government officials and researchers must shield potential safety issue from public scrutiny."*

অর্থাৎ ভ্যাকসিন প্রস্তুতের তথ্য – ব্যক্তি মালিকানার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় জনসম্মুখে অপ্রকাশিত রাখাই আইন দ্বারা সংরক্ষিত। ভ্যাকসিন এর প্রতি বিশ্বাস বজায় রেখে – সমালোচনা না করার বিধান দেওয়া হয়েছে – পাছে সাধারণ মানুষ ভ্যাকসিন ব্যবহার করতে অস্বীকার করে।

ইবোলা ভাইরাস কি জীবাণু অস্ত্র?

ইবোলা ভাইরাসকে জীবাণু অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা যাবে কিনা এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মত পার্থক্য ছিল। যদিও তা প্রাণনাশক তথাপি সূর্যালোকে ও উত্তাপে দ্রুত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কোন ভেক্টর দ্বারা বাহিত নয়। প্রাকৃতিকভাবে জল বা বায়ু দ্বারা সংক্রমণ ছড়ায় না। ফলে ইবোলা ভাইরাস জীবাণু অস্ত্ররূপে ব্যবহারের জন্য আদর্শ নয়। তথাপি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজিস্ট পিটার ওয়ালস-এর সিবিএস আটলান্টায় প্রকাশিত রিপোর্টে ইবোলা ভাইরাসকে পাউডার রূপে বোমার মধ্যে রেখে, সেই বোমা জনবহুল এলাকায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়ালস, দি সান পত্রিকায় উল্লেখ করেন যে এই রোগ হতে পারে বহু ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কারণ, সংক্রামক রোগ এবং জৈবসন্ত্রাসবাদের বিশেষজ্ঞ, নিউইয়র্কের ডাক্তার রবার্ট লেগিয়াড্রো এক সাক্ষাৎকারে লাইফ সায়েন্স পত্রিকাকে জানিয়েছেন যে যদিও সিডিসি ইবোলা ভাইরাসকে জৈবসন্ত্রাস সৃষ্টিকারী বস্তুরূপে তালিকাভুক্ত করেছে তথাপি এর অর্থ এই নয় যে ঐ ভাইরাসকে বোমের মাধ্যমেই ব্যবহার করা হবে।

ইবোলা ভাইরাস জীবাণু অস্ত্ররূপে কতটা শক্তিশালী হতে পারে তা পরীক্ষা করার জন্য এবং ইবোলা প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কারের জন্য আমেরিকার ডিওডি ও এনআইএইচ ম্যাসাচুসেটাস ভিত্তিক Sarepta Therapieutices এবং কানাডা ভিত্তিক Tekmira Pharmaceuticals এর মাধ্যমে গবেষণার জন্য কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এই বিনিয়োগ বন্ধ করে দেয়। বেসরকারী বায়োটেক কোম্পানি, অন্য ওষুধ কোম্পানি, শিক্ষা কেন্দ্র ও সরকারী কোম্পানি একত্রে জীবাণু যুদ্ধের অস্ত্র গবেষণার বিষয়ে

অগ্রসর হয়। আর্থিক চাপে পড়ে ডিওডি হঠাৎ করে ইবোলা প্রতিষেধকের জন্য অর্থ বিনিয়োগ বন্ধ করে দেয়।

অনেকের মতে ইবোলা ভাইরাসের variant, Marburg virus সোভিয়েত ইউনিয়নে উদ্ভূদ হয়েছিল। যা সম্ভবত যথেষ্ট বলিষ্ঠ Strain। সোভিয়েত ইউনিয়নে ইবোলা ভাইরাস নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। ইবোলা ভাইরাসের সঙ্গে স্মল পক্স ও অন্যান্য রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের অংশের আদান-প্রদান ঘটিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। যদি এইসব গবেষণা সফল হয়ে থাকে তবে জৈব সন্ত্রাস সৃষ্টির উপাদান রূপে ইবোলা ভাইরাস উপযুক্ত।

ইবোলা ভাইরাস এআইডিএস ভাইরাসের অনুরূপ – যারা শুধুমাত্র রক্ত ও বডিফ্লুইড এর মাধ্যমে সংক্রামিত হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে Genetic engineering অথবা Dispersal পদ্ধতিতে এই ভাইরাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে কুয়াশা বা ধোঁয়ার আকারে ছড়িয়ে দিয়ে সংক্রমণ ঘটানো বাস্তব সম্মত এবং এই ভাইরাস জৈব প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে নিজেই বায়ু বাহিত হয়ে রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ধারণ করবে।

২০০৬ সালে Texas বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী Dr. Eric R Pianka বিশ্বের জনসংখ্যার ৯০% কমানোর জন্য ইবোলা ভাইরাস ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে বলেন, "... an airborn version of Ebola would be more effective than the HIV/AIDS virus has been since it released in 1979 because of the speed in which the victim dies;"

আমেরিকার জাতীয় প্রতিরোধের জন্য অনুমোদিত আইন অনুযায়ী ড্রোন পরীক্ষার ৬টি সামরিক ক্ষেত্র স্থাপন করা হয়েছে। ন্যাশনাল ডিফেন্স অথরিটি এবং ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড যৌথভাবে ঘোষণা করেছে – ২০১৫ সাল থেকে মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়ার নামে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে কমপক্ষে ৩০,০০০ ড্রোন অনুসন্ধান চালাবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২০১৪'র ফেব্রুয়ারী মাসে এক চুক্তিতে এই মর্মে স্বাক্ষর করেন যে ২০১৫ সাল থেকে জাতীয় বিমান পোতগুলির সঙ্গে যৌথভাবে ড্রোন পরিচালনা করা হবে। এই ড্রোনগুলি নাগরিক বিমান পথগুলিকে ব্যবহার করবে। গত জুন মাসে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ডিএইচএস-এর (ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি) অফিসারদের কাছে প্রদর্শন করেছেন যে কিভাবে ভুল জিপিএস সংকেত পাঠিয়ে ড্রোনগুলিকে নির্দিষ্ট পথ থেকে ভুল পথে চালিত করা যায়।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সহজেই ড্রোনের মাধ্যমে ইবোলার ন্যায় জীবাণু অস্ত্র দ্বারা ব্যাপক সাধারণ মানুষকে আক্রান্ত করা যেতে পারে। সংক্রমণ ও ধ্বংস সাধন করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে – আদর্শ জীবাণু অস্ত্রের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আর মৃত্যুর হার সাধারণের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবাণুর মারণ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। তাৎক্ষণিকভাবে সংক্রমণ ছড়িয়ে দিয়ে নাটকীয়ভাবে শহরের জনসংখ্যা হ্রাস করা যেতেই পারে।

ইবোলা ভাইরাসের উদ্ভাবন, পর্যায়ক্রমিক স্ট্রেইন-এর পরিবর্তন, মারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ইবোলাকে বায়ু দ্বারা সংক্রামিত করার প্রচেষ্টা এবং সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য ড্রোন পরিচালন ব্যবস্থায় আমেরিকার প্রশাসনিক শীলমোহর প্রদান – এর পরেও কি সন্দেহ থাকতে পারে – যে ইবোলা ভাইরাস একটি কৃত্রিম পরিকল্পিত জীবাণু অস্ত্র!

সরলতা ভাল, অতি সরলতা অনেক সময় ঠকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর সরলতার ভান করা – শয়তানিরনামান্তর।

এই প্রসঙ্গে লিওনার্ড জি হোরোউইৎজ-এর ইমার্জিং ভাইরাসেস ঃ এইডস অ্যান্ড ইবোলা – নেচার, অ্যাক্সিডেন্ট অর ইনটেনশনাল? পুস্তক থেকে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হল।

১) আফ্রিকার সবুজ বানরের দেহ থেকে সমকামী পুরুষের মাধ্যমে মানব সমাজে এইডস ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে – এটাই ছিল, মানব সমাজে এইডস সংক্রমনের জন্য হু-এর প্রদত্ত তত্ত্ব। কিন্তু গে সম্প্রদায় ও আফ্রিকার বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য ছিল এইচআইভি মানুষের তৈরী করা ভাইরাস। যা একপ্রকার জীবাণু অস্ত্র – বোভিন লিমফেট্রপিক ভাইরাস-এর (বি এল ভি) সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয় গবেষণায় জানা গেছে এইচআইভি, বিএলভি-এর অনুরূপ। নেচার পত্রিকার এই বক্তব্য প্রচার করে স্ট্রেকার বলেছিলেন যে ভাইরাসবিদ্যা সাপেক্ষে এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে বানর থেকে এইচআইভি মানুষে সংক্রামিত হয়েছে। তিনি বিশেষ জোড় দিয়ে বলেছিলেন, "Since **there are no genetic markers in the AIDS virus** typical of the primate, and the AIDS virus cannot thrive in the monkey." (জোর সংযোজিত)

২) ড. রবার্ট স্ট্রেকার ছিলেন একজন ইন্টারনিস্ট, গ্যাসট্রোএন্টেরোলজিস্ট, ফার্মাকোলজিতে ডক্টরেট, প্যাথোলজি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং বীমা সংস্থার পেশাদার

উপদেষ্টা। তিনি প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখান এইডস মহামারী ও ভাইরাস বিপুল পরিমাণে বীমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। অনুসন্ধান চালানোর সময় তিনি, 'দি স্ট্রেকার মেমোরেন্ডাম' নামক একটি বিতর্কিত ভিডিও টেপ প্রকাশ করেন। এতে তিনি অভিযোগ করেন, এইডস ভাইরাস ছিল **"রিকোয়েস্টেড" "ক্রিয়েটেড" এবং "ডিপ্লয়েড"** এবং এর সংক্রমণের ফলাফল যে মহামারী সৃষ্টি করবে তা বহু পূর্বেই অনুমেয় ছিল। তাঁর মতে ইউএস পিএইচএস-এর তত্ত্বাবধানে স্পনসরড **১৯৭৮-১৯৭৯** সালে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনের পরীক্ষামূলক প্রয়োগের ফলেই আমেরিকার সমকামীদের মধ্যে এইডস ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে। ঐ সময় কোলিং লিখেছিলেন, "The USPHS notes the recepients were sexually active, having more than one sexual partner, and at perticular risk for developing hepatitis. The homosexual populations given the vaccination were in six major cities, including New York, San Francisco, Los Angeles, St. Louis, Houston and Chicago. Epidemiologically, these cities now have the highest incidence of AIDS and ARC (AIDS related complex), as well as the highest death rates from AIDS.

৩) একজন দন্ত বিশেষজ্ঞ ড. ডেভিড এসার ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ সালের মধ্যে ৬ জনের মধ্যে এইডস ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটিয়েছে বলে এডওয়ার্ড পারসন অভিযোগ করেন। এডওয়ার্ড পারসনের সঙ্গে এক ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় ড. হোরোউইৎজ বলেন, "Acer was outraged by the notion that the American homosexual community had been Specifically targeted to receive HIV-tainted hepatitis B vaccinations during the 1970's." হোরোউইৎজ, এসার প্রসঙ্গে বলেন, "Moreover, Acer may have fulfilled a remarkble destiny - creating one mystery to help solve a large one - the origin of AIDS, Ebola and other 'emerging viruses'."

৪) হোরোউইৎজ বলেছেন যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসার এবং সে বিষয়ে সরকারের লক্ষ্য না করার ভান-হতে পারে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মহামারীর কারণ। সিআইএ এবং ডিওডি'র উদ্যোগে জীবাণু গবেষণার উন্নতি ঘটানো – এটাই হতে পারে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় – যা বহন করে নতুন ভাইরাস উদ্ভাবনের সাক্ষ্য।

৫) হোরোউইৎজ প্রশ্ন করেছেন, পূর্বের ও বর্তমানের যথাক্রমে অচেতন ও সচেতন লাইভ ভাইরাল ভ্যাকসিন প্রস্তুত ও ব্যবহার করার বিপদের দায় কি সমমানের হতে পারে?

৬) ১৯৭০ সালের শুরুতে স্ট্রেকার হু'র গবেষণা, পরীক্ষা করে তাঁর বিজ্ঞানীদের কাছে ফাঁস করে দেন যে, এমন ভাইরাস ভেড়া ও গরুর মধ্যে পাওয়া গেছে যা টি লিম্ফোসাইটস কোষের ইমিউনোলজিক রেসপন্স ক্ষমতা পরিবর্তন করতে সক্ষম। স্ট্রেকার ও তাঁর অনুগামীরা পাঠকদের এই বিষয়ে প্রেরণা যোগাতে –

"PLEASE WAKE UP" শীর্ষক নামে লেখেন –

"In 1969 ... US defence department requested and got \$10 million to make the AIDS virus in labs as a political/ethnic weapon to be used mainly against Blacks. The feasibility programme and labs were to have been completed by 1974-75; the virus between 1974-79. WHO started to inject AIDS-laced smallpox vaccine into over 100 million Africans (population reduction) in 1977. And 2000 young white male homosexuals (Trojan horse) in 1978 with hepatitis B vaccine through the Centers for Disease Control/New York Blood Center ... "

৭) সোভিয়েত ইউনিয়নের জীবাণু অস্ত্রের ভান্ডার সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করে Mr Poor বলেছিলেন There are two things about the biological agent field I would like to mention. One is possibility of technological surprise. Molecular biology is a field that within a period of 5 to 10 years it would be possible to produce a synthetic biological agent, an agent that does not naturally exist and for which no natural immunity could been acquired."

৮) স্ট্রেকার-এর তথ্য থেকে জানা যায়, "the DOD provided one contract in 1970 \$10 million for the development of a synthetic biological agent with no natural immunity. "

৯) ১৯৭২ সালে টি সেল ধ্বংসকারী ভাইরাস আবিষ্কার হয়, অথচ হু'র তৎকালীন বুলেটিনে তা প্রকাশ করা হয়নি।

১০) ১৯৮৩ সালে, 'নেচার' পত্রিকার এক নিবন্ধে ফ্রান্সের

পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউট এবং Lac Montagnier এর সম্মান জানানো হয় এই বলে, "for having isolated LAV, the first AIDS virus- was under suspicion for allegedly importing tainted hepatitis B vaccine serum from the United States."

১১) এন আই এইচ এবং এন সি আই সেলুলার কন্ট্রোল মেকানিজম-এর বিভাগীয় প্রধান – ডঃ রবার্ট গেলো, যিনি লিউকোমিয়া'র জন্য দায়ী আরএনএ–রেট্রোভাইরাস-এর আবিষ্কারক, দেখান যে কিভাবে এক স্ট্রেইন-এর ভাইরাসের রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড অন্য স্ট্রেইন-এর ভাইরাসের মধ্যে প্রবেশ করালে যে মিউট্যান্ট সৃষ্টি হয় তা এইডস ভাইরাসের অনুরূপ কাজ করে।

১২) ইউ এস অফিস অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি'র প্রাক্তন ডেপুটি ডাইরেক্টর ইভান এল বানেট জুনিয়র তাঁর এক বক্তব্যে বলেন যে, রাসায়নিক অস্ত্র ও জীবাণু অস্ত্র উভয়েই গুপ্তভাবে অন্তর্ঘাতমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়।

যা পেলাম

১) বিগত বেশ কয়েক দশক ধরে জীবাণু নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্য হল – বিজ্ঞানের আধুনিকতম প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবাণু অস্ত্র তৈরী করা।

২) লাইফ-ভাইরাল ভ্যাকসিন তৈরীর সময় প্রাকৃতিকভাবেই তা অন্য কোনও জীবাণু সমৃদ্ধ হতে পারে। আবার উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেও মানব দেহে কোনও ভ্যাকসিন প্রয়োগের মাধ্যমে অন্য কোন জীবাণুর সংক্রমণ ঘটানো হয়েছে।

৩) অনুমোদন প্রাপ্ত লাইভ-ভাইরাল ভ্যাকসিন-এর মাধ্যমে অন্য কোন জীবাণু সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা আছে কিনা তা পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক নয়।

৪) রোগ সংক্রমণ ঘটিয়ে ওষুধ কোম্পানিগুলির ওষুধ ও ভ্যাকসিনের চাহিদা সৃষ্টি করা।

৫) রোগ নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়া এবং অপ্রমাণিত ওষুধ ব্যবহারের স্বীকৃতি দান।

৬) এবছর, স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতায়, ইবোলার মতন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরেও ৪৫% মানুষ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

৭) ইবোলা ভাইরাসের বিভিন্ন স্ট্রেইন-এর মারণ ক্ষমতা বিভিন্ন।

৮) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও মলিকিউলার বায়োলজি'র শিক্ষার প্রয়োগে যে কোনও সময় কৃত্রিমভাবে স্ট্রেইন পরিবর্তন করা এবং এইচআইভি ও ইবোলার মত সম্পূর্ণ নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করা সম্ভব।

যা হওয়া উচিত

১) সাধারণের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সকলের জন্য নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণ সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। আর খাদ্য যেহেতু বাজার থেকে কিনেই খেতে হয় তাই পরিবারের সকলের সুস্থ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পারিশ্রমিকের বিনিময় প্রাপ্ত বয়স্ক সকলকে কর্মে নিযুক্তির ব্যবস্থা চাই।

২) লাইফ ভাইরাল ভ্যাকসিন প্রস্তুতির পরে বাধ্যতামূলক পরীক্ষার পর মানুষ এবং গৃহপালিত ও খামারের পশুদের উপর প্রয়োগ করা যাবে। ভ্যাকসিন প্রস্তুতির জন্য সেল কালচার পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

৩) সকল প্রকার ওষুধের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

৪) জীবাণু নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্য হবে যতদূর সম্ভব রোগমুক্ত সমাজ সৃষ্টি করা। জীবাণু যুদ্ধের অস্ত্র ব্যবহারের জন্য জীবাণু নিয়ে গবেষণা নিষিদ্ধ করতে হবে।

জীবাণু যুদ্ধের শেষ কোথায়?

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বাজার দখলের স্বার্থে যুদ্ধ অনিবার্য আর জীবাণু যুদ্ধ যুদ্ধের একটি উপায় মাত্র। কলেরা, কুষ্ঠ, বসন্ত প্রভৃতি রোগের দ্বারা মানব সমাজ প্রাকৃতিকভাবে আক্রান্ত হত এক সময় এবং বহু মানুষ মারা যেত। এই রোগগুলি থেকে মুক্তি পেতে বিজ্ঞানের গবেষণা ও আবিষ্কারগুলি পুঁজিপতি শ্রেণীর বাজারের স্বার্থ রক্ষা করলেও তা ছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। **আর আজ সঙ্কটাপন্ন পুঁজিপতিশ্রেণী কৃত্রিমভাবে বাজার সৃষ্টির জন্য এবং বাজার দখলের জন্য বিজ্ঞানকে যেভাবে ব্যবহার করছে তা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম তো নয়ই বরঞ্চ মানব প্রজাতি ধ্বংসের কারণ হয়ে ওঠার ইঙ্গিত বহন করে**। মানব প্রজাতির সভ্যতা সৃষ্টি ও তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইতিহাস থেকে দেখা যায় এর চালিকাশক্তি হল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম – উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং উৎপাদন বিকাশ। পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে নিয়ন্ত্রিত উৎপাদনের বিকাশ মুনাফা ভিত্তিক বন্টন ব্যবস্থার জালে আবদ্ধ হয়ে পশ্চাৎমুখী হয়ে পড়েছে। শ্রেণী বিভক্ত

সমাজে শুধুমাত্র পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ মিটানোর নিয়ম এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে যা আসলে মুনাফা ভিত্তিক বন্টন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক উৎপাদন চালু হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করেছে। প্রয়োজন ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে বিজ্ঞানের অপব্যবহার হয়েই চলবে। যা হওয়া শুরু হয়েছে বহু পূর্বেই, এখন তা সংপৃক্ত স্তরে পৌঁছে গেছে। এমতাবস্থায় বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের বর্তমান পর্যায়ে সমাজ বিকাশের অন্তরায়গুলির অপসারণ করতে এগিয়ে আসাই একমাত্র উপায়। যা জীবাণু যুদ্ধ সহ সমস্ত রকম যুদ্ধের অবসান ঘটাবে। বিজ্ঞানের ব্যবহার শুধুই জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠবে। ■

প্রজাতিভেদে গড় মৃত্যুহার

জাইরে প্রজাতি	-	৭৯%
সুদান প্রজাতি	-	৫৩%
আইভরি কোস্ট প্রজাতি	-	০%
বুনদিবুগিও প্রজাতি	-	২৭%

ইবোলার আরও এক প্রজাতির সন্ধান মিলেছে ১৯৮৯ সালে। রেস্টন প্রজাতি নামে পরিচিত এই প্রজাতি পাওয়া গিয়েছে আমেরিকা, ইতালি ও ফিলিপিন্সে। কিন্তু এখনও এর জন্য কোনও প্রাণহানি হয়নি।

যেভাবে ছড়ায় ইবোলা

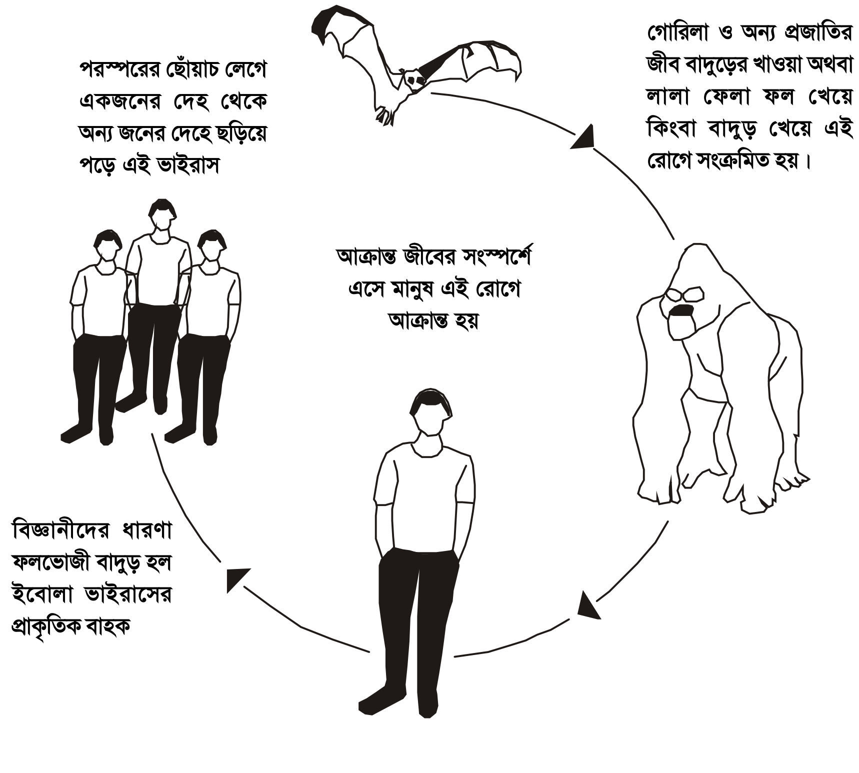

জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধান ঃ

আমরা খুব ছোটবেলার কথা মনে রাখতে পারি না কেন?

অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা আমাদের খুব ছোটবেলার কথা, বিশেষ করে ৫ বছর বয়সের আগের কথা প্রায় কিছুই মনে রাখতে পারি না। ৮ বছর বয়স পর্যন্ত জীবনের কথা বা স্মৃতির টুকরো টুকরো মনে থাকলেও সারিবদ্ধ প্রণালীতে তাকে স্মরণে প্রায় কেউই রাখতে পারেন না। এর বৈজ্ঞানিক কারণ কী?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে প্রথমে আমাদের মনোবিজ্ঞান বা সাইকোলজির ভাষায় স্মৃতি কি তা জানতে হবে। মনোবিজ্ঞান বা সাইকোলজির ভাষায় স্মৃতি বা মেমোরি হল একটা জটিল জৈবনিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য বা ইনফরমেশন মানব মস্তিষ্কে এনকোড বা লিপিবদ্ধ, স্টোরড বা সঞ্চিত এবং রিট্রিভ বা পুনরায় স্মরণ করার ব্যবস্থা হয়। বহির্জগতের ঘটনাবলী প্রথমে মস্তিষ্কে কতগুলি ভৌত এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় (স্টিমুলেশন) অনুভূতির স্তরে পৌঁছায়। এটা হল লিপিবদ্ধকরণ বা এনকোডিং; স্টোরিং বা সঞ্চয় হল দ্বিতীয় প্রক্রিয়া যাতে এইসব লিপিবদ্ধ তথ্য স্থায়ীরূপ পাওয়ার সূচনা প্রক্রিয়া। সবশেষ প্রক্রিয়া হল এইসব সঞ্চিত তথ্যগুলি পুনরায় স্মরণ করার বা রিট্রিভাল প্রক্রিয়া।

স্মৃতি দুই প্রকারের হয় – স্বল্পকালীন স্মৃতি বা শর্ট টার্ম মেমোরি এবং দীর্ঘকালীন স্মৃতি বা লং টার্ম মেমোরি। স্বল্পকালীন স্মৃতি হল নার্ভতন্তুর সাথে মস্তিষ্কের একপ্রকার সংযোগ যা নির্ভর করে মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোব (বিশেষ করে dorsolateral prefrontal cortex) এবং প্যারাইটাল লোবের বিকশিত হওয়া ও ভূমিকার উপর। অন্যদিকে দীর্ঘকালীন স্মৃতি নির্ভর করে সমস্ত মস্তিষ্কের মধ্যে নার্ভীয় যোগাযোগের স্থায়ী পরিবর্তনের উপর। মস্তিষ্কের হাইপোক্যাম্পাস হল সবচেয়ে জরুরি অঙ্গ স্বল্পকালীন স্মৃতিগুলির দীর্ঘকালীন স্মৃতি হওয়ার ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানীরা একজন রোগী হেনরি মোলাইসনের মস্তিষ্কের দুটি হাইপোক্যাম্পাস সরিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে ওই মানুষটি কোনও ঘটনাবলী খুব অল্প সময়ের জন্য মনে রাখতে পারছেন। বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই মনে করেন যে স্বল্পকালীন স্মৃতিগুলি সংঘবদ্ধরূপে দীর্ঘকালীন স্মৃতিতে রূপান্তরিত হতে ঘুম একটি বড় ভূমিকা পালন করে।

শরীর বিজ্ঞানীদের মতে শুধু হাইপোক্যাম্পাস নয়, মস্তিষ্কের অ্যামিগডালা এবং স্ট্রাইটাম-ও বড় ভূমিকা পালন করে দীর্ঘকালীন স্মৃতি গঠনে। কোনও মানুষের মস্তিষ্কের অ্যামিগডালা অংশ নষ্ট হয়ে গেলে সে আবেগপূর্ণ ঘটনাগুলি মস্তিষ্কে দীর্ঘস্থায়ীরূপ সঞ্চিত রাখতে পারে না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতিগুলি প্রথমে মস্তিষ্কের কর্টেক্সের হাইপোক্যাম্পাস অংশে সঞ্চিত হয় এবং সবশেষে টেম্পরাল কর্টেক্স-এ তার প্রক্রিয়াকরণ সম্পূর্ণ হয়।

মস্তিষ্কের কর্টেক্স অংশ জন্মের সময় সম্পূর্ণ অবিকশিত থাকে। আমরা যত বড় হই ততই এই কর্টেক্স বিকশিত হয় এবং তা পূর্ণরূপ বিকশিত হয় সাধারণভাবে ৮ বছর বয়সে। একদম ছোটবেলা মস্তিষ্কের হাইপোক্যাম্পাস সহ কর্টেক্স-এর বিকাশ সম্পূর্ণ না হওয়ায় ছোটবেলার অধিকাংশ স্মৃতি মস্তিষ্কে নিখুঁতভাবে সঞ্চিত হয় না। তাই খুব ছোটবেলায় বিশেষতঃ ৫ বছরের কম বয়সের স্মৃতিগুলি হারিয়ে যায়। একে শরীর বিজ্ঞানের ভাষায় শিশুকালের স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়া বা চাইল্ডহুড অ্যামনেশিয়া বলা হয়।

দ্বিতীয়তঃ কোনও একটি স্মৃতিকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যায় কেউ যদি ঘটনাটির বিবরণগুলি এবং তার কার্যকারণ সম্পর্ক (কনটেক্সট) না বুঝতে পারে, ঘটনাটির অর্থ ভাল না বুঝতে পারে তবে তা ভালভাবে স্মরণে রাখতে পারে না। শিশুরা যেহেতু যেখানে বাস করে এবং যে পরিস্থিতিতে থাকে তার সামগ্রিক বিবরণ ও তার কার্যকারণ সম্পর্ক বোঝে না এবং চারপাশে ঘটে চলা সব বিষয়ের অর্থ তার কাছে স্পষ্ট হয় না তাই তাদের মস্তিষ্কও সেগুলিকে স্মৃতি হিসাবে ধারণ করতে পারে না।

মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন এবং আমরা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি যে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই তার ৩-৪ বছর বয়সের স্মৃতি স্মরণে রাখতে পারে। যদিও বা কিছুকাল পারে তবুও সেই স্মৃতি দীর্ঘকাল স্মরণে থাকে না। শিশুদের বিষয় সম্পর্কে ধারণা বা জানার অক্ষমতা বা সীমাবদ্ধতা (কগনিটিভ লিমিটেশন) শৈশব অবস্থায় স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়ার কারণ।

শিশুকালের স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়ার অপর কারণ সামাজিক। সামাজিক প্রক্রিয়ায় মানুষ নিজেদের জীবনের ঘটা ঘটনা অপরের সাথে চর্চা করে। এই সামাজিক আদানপ্রদান বা ঘটনা বা স্মৃতি চর্চার ফলে মস্তিষ্কে তা স্থায়ীভাবে সঞ্চিত হয়। বড়রা ভাষার ব্যবহার করে জীবনের স্মৃতি সমাজের মধ্যে একে অপরকে বলে, সামাজিকভাবে চর্চিত হয়। এর

ফলে স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী হয়। ছোটবেলা যখন শিশু ভাষার ব্যবহার জানে না বা কথা বলতে পারে না তখন সে তার চারপাশের ঘটনা যেহেতু বাবা-মা বা অন্যকে বলতে পারে না, শিশুর স্বল্পকালীন স্মৃতি সমাজে চর্চিত হয় না তাই তা শিশুর স্মৃতিতে থাকে না।

বাবা-মা এবং বাড়ি বা সমাজের অন্যদের সাথে কথাবার্তার মধ্য দিয়েই বড়রা জীবন স্মৃতি শিশুদের শেখায়। এইভাবে বড়রা শিশুদের তার অতীত ও বর্তমানের কথা শেখায় এবং ভবিষ্যতের কথা অনুমান করতে শেখায়। এই সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শিশুরা তার জীবনস্মৃতি এবং পারিপার্শ্বিক ঘটে চলা ঘটনা মনে রাখার প্রক্রিয়ায় সামিল হয়। একটি শিশু সাধারণত তার দুই বছর বয়স হওয়ার পর থেকেই অর্থাৎ যখন থেকে সে সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করে কথা বলতে শুরু করে তখন থেকেই তার স্মৃতির বিবরণ দিতে শুরু করে। কিন্তু প্রথমদিকের স্মৃতিগুলি অস্পষ্ট ও খাপছাড়া হয় এবং এর বিবরণ ও কার্যকারণ সম্পর্ক এবং অর্থ না বোঝায় তা স্মরণে থাকে না। বড় হয়ে ওই শিশুটি যখন ওই সময়কার স্মৃতি হাতড়ায় তখন তার অধিকাংশই মস্তিষ্কে সঞ্চিত না হওয়ায় মনে করতে পারে না।

পুরাণে এবং ভাববাদীদের নানা রচনায় মহাপুরুষদের জন্মলগ্ন হতে সবকিছুর স্মৃতিতে রাখার যে প্রচার করা হয় তা বৈজ্ঞানিকভাবে অসত্য। ভাববাদীরা নানা কাহিনীতে এমনও প্রচার করে থাকে যে মহাপুরুষরা জন্মের আগে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়কার স্মৃতিও নাকি স্মরণে রাখতে পারেন। এসব কাল্পনিক এবং অসত্য।

বৌদ্ধ পুরাণে জাতকের কাহিনী এবং নানা প্রচারে পূর্ব জন্মের স্মৃতির কথা বা জাতিস্মরের কাহিনী জনসমাজে সুকৌশলে এমনভাবে পেশ করা হয় যেন তা সত্য এবং কিছু মানুষের এই অলৌকিক ক্ষমতা থাকে। বিজ্ঞানীরা বলেন, সমাজে যাদের জাতিস্মর বলা হয় তাদের মধ্যে ডুয়ার পার্সনালিটি সিন্ড্রোম বা একসাথে দুটি ব্যক্তিসত্বার প্রকাশ থাকে। তাই সমাজ ওই ব্যক্তির একসাথে দুইব্যক্তিসত্বাকে দুটি জন্মের প্রকাশ মনে করে।

বিজ্ঞানীরা বলেন স্মৃতি একটি জটিল জৈবনিক ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উন্নত জীব তার মস্তিষ্কে পারিপার্শ্বিক ঘটনা স্মরণে রাখে সামাজিকভাবে চর্চার মাধ্যমে। মৃত্যুর সাথে সাথে শরীরের অন্য অঙ্গের সঙ্গে মস্তিষ্কের ধ্বংস সাধন হয়। ফলে স্মৃতিগুলির অবসান হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন পূর্বজন্ম বা পরজন্ম অর্থাৎ জন্মান্তর বলে কিছু হয় না। এটা একটা কল্পনামাত্র। মানুষ এবং বেশ কিছু উন্নত জীবের ক্ষেত্রে বিশেষত যাদের উন্নত মস্তিষ্ক আছে তাদের শরীরের বিকাশের সাথে সাথে এবং সামাজিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্মৃতি রোমন্থন করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। এক ব্যক্তিসত্বার বিকাশ হয়। একেই ভাববাদীরা আত্মা বলে। তারা বলে আত্মা অবিনশ্বর। মানুষ সহ অন্য জীবের মৃত্যুর পর এই আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। এই প্রচার সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং অবৈজ্ঞানিক। পূর্বের সামন্ত সমাজ এবং আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে সাধারণ মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে এই ভাববাদী দর্শন ক্রিয়াশীল।

[তথ্যসূত্র ঃ হিন্দু ৩১শে জুলাই ২০০৩,
কোয়েশ্চেন কর্নার এবং উইকিপিডিয়া]

সৃষ্টিশীলতা কি 'ঈশ্বরপ্রদত্ত' ?

মানুষের সৃষ্টিশীলতার উৎস কী? এবিষয়ে নানা মুনির রয়েছে নানা মত। একদল বলেন এটা জন্মগত, জন্মের সময় হতেই কোন এক অজানা কারণে কেউ কেউ হয়ে ওঠেন সৃষ্টিশীল, আর বাকিদের থাকেনা সেই ক্ষমতা। অনেকে মনে করেন এটা ঈশ্বরপ্রদত্ত তাই এতে মানুষের কোন হাত নেই। ভাববাদী দর্শনে বিশ্বাসী মানুষজনও মোটামুটি সেটাই বিশ্বাস করে। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিকরা বিশেষত স্নায়ু বিজ্ঞানীরা এই রহস্যের উত্তর খুঁজতে ব্যস্ত বহুদিন থেকেই। এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরাও এমন ধারণা পোষণ করতেন যে মানুষের ডান মস্তিষ্কের ভিতরেই লুকিয়ে থাকে সৃষ্টিশীল হওয়ার চাবিকাঠি। আর বাম মস্তিষ্কের ভিতর রয়েছে যুক্তি মানা, হিসেব করা, বিচার-বিশ্লেষণের মতো 'গতে বাঁধা' কাজ করার ক্ষমতা। অর্থাৎ বাম মস্তিষ্কের ক্ষমতা বেশিরভাগ মানুষের একই রকম হলেও, ডান মস্তিষ্কের উৎকর্ষতা কোন কোন মানুষের অত্যধিক বেশি তাই তারা জন্ম হতেই সৃষ্টিশীল।

বহুদিন ধরে চলে আসা এই তত্ত্ব বর্তমানে সংকটে পড়েছে। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরো সায়েন্স (নিমহ্যানস্)-এর স্নায়ুমনোবিদরা দাবী করেছেন ডান-বাম-এর এই তর্ক বৃথা। বাস্তবে মানুষের

●৩৭ *পৃষ্ঠায় দেখুন*

কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা ?

নেতা-মন্ত্রী ও শিক্ষিত নামী-দামী লোকেরা

[গত সংখ্যা থেকেই এই কলম চালু করা হয়েছে। বহু পাঠক এবং কর্মীবন্ধুরা এগিয়ে এসে তথ্য দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করেছেন। এই রচনা সকলের যৌথভূমিকার ফলশ্রুতি। আমরা প্রতিটি সংখ্যায় এই ধারাবাহিক চালু রাখতে চাই সাম্প্রতিক তথ্যের ভিত্তিতে। আপনারা আরও বেশি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। – সম্পাদকমণ্ডলী]

পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে না সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে? প্রায় সকল মানুষই প্রথমটি বলবেন। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে সমাজের অধিকাংশ মানুষ, তা শিক্ষিতই বলুন আর অশিক্ষিত শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ মানুষই ফলিত জ্যোতিষের কবলে আছেন। গলায়, হাতে, কোমড়ে, সবর্ত্র হয় জড়ি, বুটি, শিকড় অথবা আংটি দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা যত বাড়ছে ততই বাড়ছে ভাগ্যনির্ধারকদের ভূমিকা।

শুধু তাই নয় একদিকে চলছে জ্যোতিষকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তির দাবী আর অন্যদিকে ফলিত জ্যোতিষ যে বিজ্ঞান সম্মত তা প্রমাণ করার আপ্রাণ প্রয়াস। মন্ত্রী, নেতা, শিক্ষক, সাহিত্যিক, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, খেলোয়াড়, নায়ক সকলেই জ্যোতিষের মাহাত্ম প্রচার করে চলেছেন প্রকাশ্যভাবে। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রতিদিন শত শত জ্যোতিষীর গুণাবলীর প্রচার হচ্ছে। টিভি খুললেই বিভিন্ন ভাষায় জ্যোতিষীরা সরাসরি শ্রোতাদের সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছেন। সাহিত্য, চলচ্চিত্র, টিভি সিরিয়াল, রেডিও তে এর অভ্রান্ত দিক তুলে ধরা হচ্ছে।

এখন আবার এটুকুই যথেষ্ট নয়। কোন কিছু অবৈজ্ঞানিক হিসাবে জানলে শিক্ষিত মানুষ তা বর্জন করে আর তা বিজ্ঞানসম্মত জানলে মেনে চলে। এই কারণে 'বিজ্ঞানসম্মত কম্পিউটারে জ্যোতিষ' বেশি আকর্ষণীয় হচ্ছে। গ্রহ-রত্নের গুণাগুণের বৈজ্ঞানিক দিক নিয়ে চর্চা করা হচ্ছে। কোন খনিজ বা পাথরের যদি নানা ভৌত-রাসায়নিক গুণ থাকে তবে তা ধারণ করলে মানুষের ভাগ্যই বা পরিবর্তন হবে না কেন– এমন প্রচার আজ অনেক জোরালো। সাধারণ মানুষকে মোহগ্রস্থ করতে রত্ন পরীক্ষা করিয়ে তা ধারণ করার চল হয়েছে। রত্নের ধারণে ভাগ্যপরিবর্তনের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে এই প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে (যেমন মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়) ভূতত্ত্বের ছাত্রদের জেমোলজি পড়ান হচ্ছে। জেমস্টোন বা রত্নের গুণাগুণ এই শিক্ষায় শিক্ষিতরা করবেন বৈজ্ঞানিকভাবে! এইকাজে ভারত সরকারের জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বড় ভূমিকা নিচ্ছে। রত্নের ক্রেতারা জ্যোতিষীর দ্বারা প্রেসক্রিপশন করা রত্নটির গুণাগুণ পয়সা দিয়ে জি এস আই তে করাতে পারেন। জিএসআই এক্সরে এবং অন্য পদ্ধতির সাহায্যে গুণাগুণের রিপোর্ট দিচ্ছেন। সেই রিপোর্ট নিয়ে খদ্দের জ্যোতিষীর কাছে যাচ্ছেন এবং জ্যোতিষী গম্ভীরমুখে রিপোর্ট পড়ে দোষমুক্ত রত্নটি খদ্দেরকে দিচ্ছেন। খদ্দের এবার ফল নিশ্চিত জেনে বিশ্বাস ভরে রত্ন ধারণ করছেন। অবিজ্ঞান বিজ্ঞানের হাত ধরে অপবিজ্ঞান হয়ে মানুষকে চির অন্ধকারে নিমজ্জিত করছে।

বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে শুধু সাধারণ জনতা নয় পুঁজিপতি এবং সম্পদের অন্যান্য মালিকরা রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী এবং সেলিব্রেটি সকলেই অনিশ্চয়তার কবলে। অনিশ্চয়তার কবল থেকে রেহাই পেতে তারাও ভাগ্যপরিবর্তনের জন্য জ্যোতিষীদের দ্বারস্থ। এই ব্যাপারে ডান-বাম-মধ্য সকল পার্টি, হিন্দুত্ববাদী, জাতীয়তাবাদী, সমাজবাদী এবং এমনকি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরাও পিছিয়ে নেই। এঁরা নিজেরাও এর কবলে পড়ছেন এবং জনতাকেও বেশি বেশি করে এপথে টেনে আনার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন। এর কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল।

১) এবছর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দোলা সেন (যিনি পূর্বে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন বলে দাবী করেন) জ্যোতিষীর পরামর্শমত নির্দিষ্ট দিনে মনোনয়নপত্র পেশ করেছিলেন। যদিও তাঁর ভাগ্যলক্ষী তাঁর দিকে মুখ ফেরাননি।

২) এবছর ওড়িশার গঞ্জাম জেলার গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য জাতীয় কংগ্রেস ও বিজেপি-র প্রার্থী উভয়েই নিজ নিজ জ্যোতিষীর পরামর্শ মেনে নির্দিষ্ট দিনে মনোনয়ন পেশ করেন এবং আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা করেন বিধায়ক হয়ে ওঠার জন্য। এঁদের ভাগ্যলক্ষীও এঁদের হতাশ করেছেন। কেউই বিধায়ক হতে পারেন নি।

৩) কিছুদিন পূর্বে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব তান্ত্রিক পাগলা বাবার কাছে চারা-ঘোটালা (গাওলা কেলেঙ্কারি) কেসের হাত থেকে বাঁচার জন্য তন্ত্র সাধনা, জ্যোতিষের পরামর্শ সবই নিয়েছিলেন। যদিও পাগলা বাবা বা জ্যোতিষী লালু প্রসাদের গ্রেপ্তার এড়াতে সাহায্য করতে পারেন নি।

৪) উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর

পিতা ও দলের সর্বময়কর্তা মূলায়েম সিং যাদব নিজেকে সমাজবাদী হিসেবে দাবী করেন। জ্যোতিষী তাঁর হাত দেখে বলেছেন যে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প শহর নয়ডা তাঁর পক্ষে অশুভ, সেখানে যেন তিনি কখনও না যান। মূলায়েম সিং তাঁর জ্যোতিষীর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বা সরকারী দলের প্রধান হয়েও কোনদিন তিনি ওই শিল্প শহরে আর পা দেন নি।

৫) দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন দলের নেতারা চিরকালই তাঁদের সৌভাগ্য লাভের আশায় মন্দির দর্শন, পূজাপাঠ, জ্যোতিষের পরামর্শ মেনে চলা থেকে এক পাও এদিক ওদিক করেন না। তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা তাঁর নামের ইংরাজি বানানের সাথে একটি বাড়তি এ অক্ষর জুড়ে দেন সৌভাগ্যের উদ্দেশ্যে। সৌভাগ্য তাঁর জীবনে বড় আকারে এল। মাসিক ১ টাকা মাত্র বেতন নেওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ২০ গুণ বৃদ্ধি পায়। যদিও জ্যোতিষের পরামর্শমত নামে এই বাড়তি 'এ' অক্ষর তার গ্রেপ্তারি রুখতে পারেনি।

৬) এদেশে যাঁরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের আগমার্কা প্রতিনিধি সেই সিপিআই (এম) দলের কেরালার নেতা টিপি চন্দ্রশেখরণ ২০১২ সালের মে মাসে খুন হওয়ার পর তাঁর খুনের দায়ে রাজ্যের মাঝারি মাপের অনেক নেতা গ্রেপ্তার হওয়ায় পার্টির রাজ্য নেতারা একজন জ্যোতিষীর কাছে দেখা করতে যান। তাঁরা জ্যোতিষীর কাছে জানতে চান ১৯৬৪ সালের পর তাঁদের দলে কি আরও একবার ভাঙন আসতে চলেছে? খবরটি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে পড়ায় নেতারা সংবাদ মাধ্যমে জানান যে নিছক কৌতুহলবশতই নাকি তাঁরা সেখানে গেছিলেন!

৭) প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঁধী এবং তাঁর পরিবারের সকলেই কুসংস্কার, জ্যোতিষ, মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী। তিনমূর্তিভবনে অতীতে ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী এবং পরবর্তীকালে সাধু চন্দ্রস্বামীর ছিল অবারিত দ্বার।

৮) ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দলের অধিকাংশ নেতারাই ধার্মিক গুরু এবং জ্যোতিষীদের উপদেশ নির্দেশ ছাড়া প্রায় কোন কাজই করেন না।

৯) সি পি আই (এম) এর তামিলনাড়ুর নেতা এ পি আবদুল্লা কুট্টি, মক্কায় হজ করতে যাওয়ায় দলে হইচই হয়েছিল। তিনি নাকি তাঁর জন্ম তারিখ এবং পরিবার সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন তাই সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে একজন জ্যোতিষের কাছে গিয়ে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত তৈরি করে আনেন।

১০) প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া মাত্র ১১ মাস ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম ৭ মাস ৭নং রেস কোর্স রোডে বসবাস করেন। জ্যোতিষী তাঁকে পরামর্শ দেন সৌভাগ্যের জন্য অন্য বাসস্থানে চলে যেতে। তিনি জ্যোতিষীর কথায় বাসস্থান পরিবর্তন করেন কিন্তু তাতে তাঁর সৌভাগ্য তাঁর সঙ্গী হয় নি। ১১ মাসের মাথায় তাঁকে পদ থেকে অপসারিত হতে হয় চিরকালের জন্য।

১১) রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় আতঙ্কিত বর্তমান পরিবহণমন্ত্রী ইত্যাদিদের ঘন ঘন তারাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাটে যেতে দেখা যায় যা বড় বড় করে খবরে প্রচারও হয়। কিন্তু এত করেও সৌভাগ্য কারও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

১২) প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন ছেলের বিয়ের সময় জানতে পারেন ঐশ্বর্য্য রাই নাকি মাঙ্গলিক। জ্যোতিষী ও তান্ত্রিকেরা বিধান দেন ঐশ্বর্য্যা-র 'দোষ কাটাতে' প্রথমে বটবৃক্ষের সাথে বিয়ে দিতে হবে। এরপরেই তাঁর পুত্র অভিষেক ঐশর্য্যকে বিবাহ করতে পারেন। এই খবর সেইসময় সব মিডিয়ায় প্রচার হয়। বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বর্য্যাকে বৃটবৃক্ষের সাথে বিবাহ দিয়ে তারপর তাঁকে পুত্রবধূ করেন বিগ বি।

১৩) শিল্পপতি নবীন জিন্দাল জ্যোতিষের কথা ছাড়া এক পাও চলেন না। ঘনশ্যাম দাস বিড়লাকে ভগবান 'স্বপ্নে দেখা দিয়ে' বলেছেন ঐশর্য্য ও সুখকে চিরস্থায়ী করতে তাঁর পরিবারকে সারা বছর ধরে মন্দির গড়ে যেতে হবে। এই কারণে বিড়লা পরিবার সারা দেশে একের পর এক মন্দির গড়ে চলেছেন!

১৪) সচিন তেন্ডুলকর, সৌরভ গাঙ্গুলি, মহম্মদ আজহারউদ্দিনের মত প্রায় সব নামী ক্রিকেটার, মারাদোনা – মেসির মত ফুটবলার, ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থা ইসরোর প্রধান, হাসপাতালের বড় ডাক্তারবাবু, সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিরা সকলেই ব্যক্তিজীবনে জ্যোতিষের, অন্যান্য কুসংস্কারের যেমন চর্চা করেন তেমনই জনসমক্ষে তার প্রচারও করেন নানা কায়দায়।

এমনই এক পরিস্থিতিতে আমরা বাস করছি। সীমাহীন সমস্যা ও অশেষ যন্ত্রণাময় পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ তাই ব্যক্তিগতভাবে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কুসংস্কারে বেশি বেশি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। কুসংস্কার, অলৌকিকত্ব, ধর্মবাদ প্রভৃতির মুখোস খুলে ধরেই শুধু অবস্থার বদল ঘটানো যাবে না। যে সামাজিক পরিস্থিতি এই সমাজকে পচনের দিকে নিয়ে চলেছে তার কারণ অনুসন্ধান করে সেই কারণের অবসান ঘটাতে না পারলে বিজ্ঞান আন্দোলন বিকশিত হতে পারে না। কুসংস্কারের উৎস এই সমাজ ব্যবস্থার অবসানের লক্ষ্যে জোটবদ্ধ বিজ্ঞান আন্দোলনই একমাত্র পথ।■

সাক্ষাৎকার ঃ

ন্যায্যমূল্যের ওষুধ – জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশন – অযৌক্তিক অপ্রয়োজনীয় নিষিদ্ধ ওষুধ প্রসঙ্গে হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন

[গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে রাজ্যের সমস্ত জেলা, মহকুমা ও ব্লক হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজে সরকার 'ন্যায্য মূল্যের' ওষুধের দোকান বা ফেয়ার প্রাইস শপ চালু হয়েছে। এই দোকানগুলিতে এম আর পি বা সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্যের উপর কোথায় ৫০% , কোথাও ৫২%, কোথাও ৫৬%, কোথাও ৬৭% আবার কোথাও ৭২% বা তারও বেশি ছাড় দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এইসব দোকান থেকে ওষুধ কিনে রাজ্যের মানুষ খুবই উপকৃত হচ্ছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যেও তাই ধারণা। কিছু মিডিয়া, ডাক্তার এবং অন্য ওষুধ কোম্পানির প্রচারে অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে– ফেয়ার প্রাইস শপে যে ওষুধগুলি বিক্রি হয় তা যথাযথ গুণমানের নয় বা তার মধ্যে ভেজাল আছে। ফেয়ার প্রাইস শপ বা ন্যায্যমূল্যের দোকানের দাম কি সত্যিই ফেয়ার? আরও নান প্রশ্ন। সর্বসাধারণের কাছে বিষয়টি যাতে পরিষ্কার হয় তার জন্য রাজ্যের সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন **'হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ'**-র সদর দপ্তরে আমরা গত ২০শে নভেম্বর ২০১৪ গিয়েছিলাম। ডাক্তারবাবুদের সাক্ষাৎকার নিতে। ওইদিন দীর্ঘক্ষণ ধরে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা আমাদের প্রশ্নের জবান দেন। 'হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন'এর পক্ষ থেকে **ডঃ হীরালাল কোনার, ডঃ ফণী মন্ডল, ডঃ স্বপন জানা** এবং **ডঃ আর পি সিং** ধৈর্য্যের সাথে আমাদের প্রশ্নগুলির উত্তর দেন। তাঁরা বলেন সরকারি চাকরি করেন এমন ডাক্তারদের নিয়ে ১৯৭২ সালে এই সংগঠন গড়ে ওঠে। সংগঠনের উদ্দেশ্য একদিকে ডাক্তারদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার এবং অন্যদিকে সরকারি চিকিৎসার সুযোগ যাতে সকলে পায়, সরকারি চিকিৎসা যাতে জনস্বার্থে হয় তা দেখা। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন সরকারের পক্ষধর ডাক্তাররা সরকারি দলের মদতে এই সংগঠন ভেঙে পৃথক সংগঠন গড়েন। বর্তমান শাসকদলও নতুন করে ভাঙন ধরিয়েছে। হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন যেহেতু সরকারের রঙ না দেখে জনস্বার্থের কথা বলে আসছে, সরকারি স্বাস্থ্যনীতি সমালোচনা করে তাই এই সংগঠনের সদস্য ডাক্তারদের কথায় কথায় শোকজ, বদলি, আর্থিক বৈষম্যের শিকার হতে হয়। সরকারের ন্যায্যমূল্যের দোকান– জেনেরিক নামে ওষুধ প্রেসক্রাইব করার নির্দেশ এবং অযৌক্তিক, অপ্রয়োজনীয় এবং নিষিদ্ধ ওষুধ চালানোর প্রতিবাদে গত ১০ই নভেম্বর আই পি জি এম ই এন্ড আর–এস এস কে এম হাসপাতাল কে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়েছে (মেমো নং– HSA/09/ dt 10.11.2014)। এই মেমোরান্ডামে অযৌক্তিক – অপ্রয়োজনীয় এবং অকার্যকরী যে সব ওষুধ সরকারি ক্যাটালগে আছে, যে ওষুধগুলি সারা রাজ্যের নানা দোকানে এবং এমনকি ফেয়ার প্রাইস শপেও বিক্রি হচ্ছে তা অবিলম্বে বাতিলের দাবি জানানো হয়েছে। দীর্ঘক্ষণের এই সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ প্রকাশ করার মত জায়গা সমীক্ষণে না থাকায় আমরা তার সংক্ষেপিত অংশ প্রকাশ করলাম। বিষয়গুলি জনস্বার্থের সাথে সম্পর্কিত। পাঠক এবং আপামর সাধারণ মানুষের তা উপকারে লাগবে আমরা এই আশাই করি – সম্পাদকমন্ডলী, সমীক্ষণ]

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ ফেয়ার প্রাইস শপ বা ন্যায্যমূল্যের দোকান ব্যাপারটা কী ?

ডঃ স্বপন জানা ঃ আসলে ফেয়ার প্রাইস শপে (এফ পি সি) দোকানদার কী দামে ওষুধ কিনছে তা দেখানো হচ্ছে না। প্রথমতঃ তারা মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে ওষুধ বেচছে ৫১ শতাংশ ছাড়ে। ওষুধের সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য (এমআরপি) ছাপানো আছে ধরুন ১০ টাকা, ছাড় দিয়ে সে বেচল ৫ টাকায়। কিন্তু সে তো কিনেছে ১ টাকায়। ১ টাকায় ৪ টাকা লাভ, মানে ৪০০ শতাংশ লাভ! এই যে ১টাকায় ওষুধটা কিনেছে এই ইনভয়েস (invoice) গুলো দেশের আইন অনুযায়ী ড্রাগ ইনসপেক্টরকে দেখানো উচিৎ। সরকারের বদান্যতায় তা দেখাচ্ছে না। এই ওষুধগুলো বাইরের অন্য দোকান কিনে পরতায় পোষাতে পারবে না, কারণ ওই ওষুধগুলোয় তাদের লাভ রাখার ক্ষমতা ২০-৩০ শতাংশ আর এফ পি এস লাভ করছে প্রায় ৪০০ শতাংশ। দ্বিতীয়তঃ প্রাইভেট ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করে ব্র্যান্ড নামে। এইসব ব্র্যান্ডগুলো বাইরের মার্কেটে পাওয়া যায়। এই ব্র্যান্ডগুলো ওই দোকানদাররা যে দামে কিনছে তা সুপারভাইস করছে ড্রাগ কন্ট্রোল। সে কত

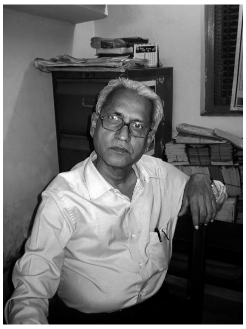
ড. আর পি সিং

ড. হীরালাল কোনার

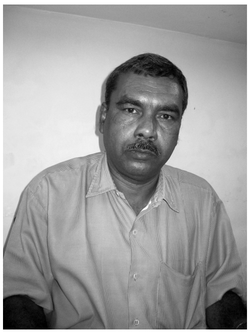
ড. স্বপন জানা

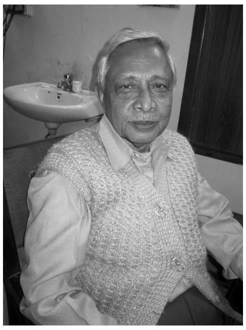
ডঃ ফণী মন্ডল

দামে কিনে সর্বাধিক কত দামে বেচবে তা ড্রাগ কন্ট্রোল দেখছে। স্বাভাবিকভাবেই এফ পি এস এ যে ওষুধগুলো আছে বাইরের দোকানদার তা বেচতে পারবে না। বাইরের দোকানগুলোও কিন্তু বাজার থেকে ১ টাকায় ওই ওষুধ কিনতে পারে, কিনে ৫০% ছাড় দিয়ে ৫ টাকায় বেচতেও পারে। কিন্তু এটা তাদের ক্ষেত্রে penal offence. তৃতীয়তঃ ওষুধের দাম নিয়ে সারা দেশে, সারা পৃথিবীতে মানুষকে মিথ্যে সেখানো হয়েছে। আমরা ফার্মাকোলজির শিক্ষকরা মিথ্যে শিখিয়েছি, ডাক্তাররা মিথ্যে শিখিয়েছেন, সরকার মিথ্যে শিখিয়েছে। ওষুধের দাম এটাই (মানে ১০ টাকারটা ১ টাকাই)। ওষুধের দাম খুব কম। একটা উদাহরণ দিলে বুঝবেন কত কম। ১ কেজি অ্যালপ্রাজোলাম থেকে ০.২৫ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট হবে ৪০ লক্ষ। আমি উৎপাদনের সময় নষ্ট হওয়া, অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে ধরলাম ২০ লক্ষ। কোম্পানি যদি ২৫ পয়সা করে তা বেচে তবে সে পাবে ২০ হাজারে ৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু বাজারে অ্যালপ্রাজোলাম ২৫ পয়সায় নেই। ফেয়ার প্রাইস শপেও প্রায় ১ টাকার কাছাকাছি। অনেকে ওষুধে ভেজালের কথা বলছেন। আমি বলি কোম্পানির তা না করলেও চলে। সে ১ ১/২ টাকার ওষুধের দাম ছেপে রাখছে ৩৫ টাকায়। এফ পি এস-এ তার ওপর ৫০-৬০-৭০ শতাংশ ছাড় দিয়ে বেচছে। আপনি চাইলে আমিও আপনাকে দেড় কাটায় তা এনে দিতে পারব লিগ্যালি এবং ইললিগ্যালি। The Mamata Govt serves the interest of the section of the drug industry in a contracted market. সমস্ত বাজারের মত ওষুধের বাজারও সংকুচিত হচ্ছে। কোন পুঁজিপতিকে জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে অন্যকে মেরে। সরকার বলছে সে মা-মাটি-মানুষের সরকার। মা-মাটি-মানুষ গ্রামে থাকে। মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে এফ পি এস-এ ৫০ থেকে ৫৬ শতাংশ ছাড় আর কলকাতায় বেশি গরীব লোক থাকে তাই এখানে কোথাও ৬০%, কোথাও ৬৭% আবার কোথাও ৭২% ছাড়! সস্তায় গরীবকে দেওয়া নয়–কম খাওয়া কুকুর আর বেশি খাওয়া কুকুরের লড়াই-এর জায়গাটায় স্পেস করে দেওয়া হচ্ছে। এন আর এস-এ ৬৭% আর উল্টোদিকে ডেন্টাল কলেজে ৭৬% – একই ওষুধ।

বি.ম ঃ ১৯৯৫ সাল থেকে ওষুধের বাজারে জেনেরিক প্রোডাক্ট আসছে। অনেক দোকানদার বিলে মাল নেয় আবার অনেকে বিল ছাড়া মাল নেয়। এরাও তো ১ টাকায় মাল কিনে ১০ টাকায় মাল বেচছে!

ডঃ জানা ঃ হ্যাঁ, জেনেরিক নামে, প্রশ্ন হ'ল তুমি এটা করতে দিচ্ছ কেন?

বি.ম ঃ শুধু জেনেরিক নয়, ব্র্যান্ড জেনেরিকও আছে।

ডঃ জানা ঃ এটা তো ওদের গল্প, আমরা বলি না। এটা প্রতিক্রিয়াশীলদের নামকরণ। ব্র্যান্ডেড জেনেরিক! হয় নাকি, 'সোনার পাথরবাটি'।

বি.ম ঃ সে তো হয় না, কিন্তু করছে তো?

ডঃ জানা ঃ সে তো লোককে বলে বলে করাচ্ছে। একটা ওষুধও জেনেরিক নামে দিচ্ছে না, ব্র্যান্ড নামে দিচ্ছে। ব্র্যান্ডেড ওষুধেও তো জেনেরিক নাম লেখা আছে। ব্র্যান্ডের সাথে ওষুধের রাসায়নিক নামটাও লেখা আছে। তাহলে সেগুলো কেন ব্র্যান্ডেড? আর ফেয়ার প্রাইস শপের গুলো ব্র্যান্ড জেনেরিক? এটা একটা দ্বিচারিতা। এটাকে রাজনৈতিকভাবে কনডেম ইস্যু করা উচিৎ।

বি. ম ঃ বাইরের দোকানেও যা পুশিং করা হয় তার ৯০ শতাংশই হল এমন ব্র্যান্ডেড জেনেরিক।

ডঃ জানা ঃ তারা পুশিং করে ওটিসি গুলো বা সেলফ

মেডিকেশন। ওই দোকানদাররা ডাক্তাদের প্রেসক্রিপশনের এগেইন্সটে কিছু পুশিং করে না। কারণ রুগীরা দেখে প্রেসক্রিপশনের সাথে ওষুধের নাম মিলছে কি না।

বি. ম ঃ অবশ্যই। আসলে ফেয়ার প্রাইস শপে যা চলছে তার বাইরেও এমনটা চলছে না তা নয়। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে হয়ত চলছে না, প্রেসক্রিপশন ছাড়া তো চলছে।

ডঃ হীরালাল কোনার ঃ হ্যাঁ, চলছে তো।

ডঃ জানা ঃ হ্যাঁ চলছে তো। পশ্চিমবাংলায় ৪০ হাজার গ্রাম আছে। এইসব গ্রামে ২ লক্ষের বেশি ইললিগাল ডাক্তার আছে। আর এই ইললিগাল ডাক্তারদের এন্টায়ার ডিসপেনসিং সিস্টেমটাই দাঁড়িয়ে আছে ফেয়ার প্রাইস শপে যে ওষুধগুলো পাওয়া যায় তার উপর।

এর একটা ইতিহাস আছে রাজীব গাঁধীর আমলে সরকার বলল ওষুধের দাম কমাতে হবে এবং বলল যে ওষুধের কোম্পানির ৫ কোটি টাকার বেশি টার্ন ওভার তারাই সিস্টার কনর্সান খুলতে পারবে। ছোট কোম্পানিগুলো স্বাভাবিকভাবেই তা পারল না। তখন র‍্যানব্যাক্সি, জিএসকে ইত্যাদি তাদের সিস্টার কনর্সান নিয়ে এল। এতে কি হল? বড় কোম্পানি খোলা মার্কেটের জন্য দামি ওষুধ বানাচ্ছে আর সিস্টার কনর্সান দিয়ে ফেয়ার প্রাইস শপের ওষুধ করছে। এর ফলে ফেয়ার প্রাইস থেকে একটা লাভ পাচ্ছে আবার সরকারের সাবসিডিও পাচ্ছে। নব্বই-এর দশকে এটাও বন্ধ হল। ১৯৭৮ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে ওষুধের দাম কমানোর খেলাটা আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ফল। সাম্রাজ্যবাদ এবং সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বের ফল। ১৯৭৭ সালে প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ড্রাগ লিস্ট পাবলিশড হয় এবং ১৯৭৮-এ ডিক্লারেশন হয়। এই দ্বন্দ্বের ফল হিসাবে সারা দুনিয়ায় এসেনসিয়াল ড্রাগ কনসেপ্ট, র‍্যাশনাল ইউস অফ ড্রাগ- এই কনসেপ্টগুলো আসে। আমরা ফার্মাকোলজি পড়ে বুঝে এইসব প্রশ্নগুলো তুলেছি এমন নয়, প্রশ্নগুলো এসেছে ওদের দেশ থেকে। ওদের দেশে ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলিকে পে করতে হয়। একটা উদাহরণ দেই। ইমাটির্ন ইন ভিসিলেন্স ক্যানসার পেসেন্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। প্রতি মাসে এই ওষুধ ব্যবহারের জন্য (নোর্ভাটিস কোম্পানির) খরচ দেড় লক্ষ টাকা। এত টাকা আমেরিকার ইনস্যুরেন্স কোম্পানি পে করবে না। এই কারণে হেলথ ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলো ক্যানসারের রুগীদের দিয়ে একটা সংগঠন (এনজিও) তৈরি করে প্রতিবাদ শুরু করে ওষুধের দাম কমাবার জন্য। সেই ইনস্যুরেন্স কোম্পানি এবং আমেরিকা সরকার বলল পেটেন্ট আইন অনুযায়ী নোর্ভাটিসের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। অন্যরাও এই ওষুধ বানাতে পারে। ভারতের ন্যাটকো,, সিপলা-কে বলল তোমরা এই ওষুধ তৈরি কর। এরা বলল আমরা তৈরি করতে পারি – এই ওষুধ সাত হাজার টাকায় দিয়ে দেব। তারা ওই ওষুধ দেড় লক্ষ টাকার বদলে ৫ হাজার ৭ হাজারে দিয়ে থাকে। আমেরিকার ইনস্যুরেন্স কোম্পানি দেখল এতে তাদের লাভ হবে। তারা অ্যালাউ করল। আর যেই অনুমতি দিল ওমনি আমেরিকার মেরিন ডের্কাস, নোর্ভাটিসের কর্মকর্তারা বলল– 'চোর ভারতবাসী, ডাকাত ভারতবাসী', ভাবতে পারেন! এই কথা আন্তর্জাতিকভাবে সে প্রচার করেছে। তা হলে কি এমন ঘটল যাতে তারা এমন চিৎকার করল? ইট ইস দেয়ার পেটেন্ট ল। ১৯৭৮-এ যত ওষুধ ছিল, সম্ভবতঃ ২৪৯ লক্ষ, সেটা কমতে কমতে ৭৪ লক্ষে এল। এই কারণে ১৯৭৮ সাল থেকে কম দামে ওষুধ আপনারা পেতেন এবং জেনেরিক ওষুধের কম দাম হত। আজ সেটাও নেই। আমার পলিটিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট বলছে ফার্মা সিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি কিছুদিন আগে ওষুধের দাম কমানোর যে কথা বলেছিল, মোদি আমেরিকা যাবার আগে 'ইট ইস উইথড্রন'।

বি. ম ঃ আপনারা গত ১০ই নভেম্বর আইপিজিএমই এন্ড আর–এস এস কে এম–এ মেমোরান্ডাম দিয়ে যে অযৌক্তিক ড্রাগ ফরমুলেশনের কথা বলেছেন – সেটা বলতে কি বোঝায়?

ডঃ জানা ঃ ইর‍্যাশনাল বা অযৌক্তিক ড্রাগ ফরমুলেশন বলতে– ইনডিভিজুয়াল হিসাবে যে ড্রাগগুলো বিজ্ঞানসম্মত, যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করা যায় তাকে আমরা র‍্যাশনাল ড্রাগ বলছি। আর অযৌক্তিক বা ইর‍্যাশনাল ড্রাগ হচ্ছে, যেমন ধরুন– আইব্রুপ্রোফেন আর প্যারাসিটামল কম্বিনেশন। আইব্রুপ্রফেনের অ্যান্টি ইনফ্লামেন্টারি এফেক্ট হচ্ছে পেরিফেরাল, প্যারাসিটামল দিলে অ্যান্টি পাইরেটিক অ্যাকশনটা প্রায় শেষ। আইব্রুপ্রোফেনের সাথে প্যারাসিটামল দিয়ে আপনি লাভ পাবেন না। দুটোর ব্যবহার আলাদা এবং পৃথকভাবে ব্যবহার করতে হবে। দুটো একসাথে মিশিয়ে দিয়েছে। এবার রুগী যদি এই কম্বিনেশন খালিপেটে খেতে যায় (শুধু প্যারাসিটামল খালি পেটে খাওয়া যায়) কিছুদিন পরে সে গ্যাস্ট্রিক ব্লিডিং নিয়ে হাজির হবে কারণ সে খালিপেটে আইব্রুপ্রোফেনও খেয়ে গেছে। অন্য উদাহরণ– যেমন ধরুন ভিটামিনের মিশ্রণ– ভিটামিন বি১, বি৬ এবং বি১২। একসাথে

কোন মানুষের এই ভিটামিনগুলির ডেফিসিয়েন্সি হয় না। তাহলে নিউরোরিবয়ন, পলিবিয়ন এই ইনজেক্সনগুলো উইথড্র হবে। ২০০১ সালে এই অর্ডারটা ইস্যু করে বলা হল মাল্টিভিটামিন বন্ধ করতে। সাথে সাথে সরকার কোম্পানিকে বলল ওর সাথে আরও কিছু মিশিয়ে দাও, তবে প্রবলেম থাকবে না। নিষিদ্ধ ওষুধ আর নিষিদ্ধ থাকল না। যেমন ধরুন স্বপন জানার বিরুদ্ধে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বেড়িয়েছে। আমি টাকা খাইয়ে পুলিশকে ফিট করে রেখেছি। পুশিল বলল 'এ সেই স্বপন জানা নয়, এ ডাক্তার স্বপন জানা'। আমি ছাড় পেয়ে গেলাম। সাইপ্রোহেপটাডিন মুলিকুলটা অ্যাপেটাইজার হিসেবে ব্যান্ড। এখন সরকার বদমাইশি করে সাইপ্রোহেপটাডিন ব্যান্ড আছে অ্যাস অ্যাপেটাইজার এই অর্ডার বার করল না, বাজারে সে কোম্পানিকে বলে দিল সাইপ্রোহেপটাডিন এর সাথে ভিটামিন বা অন্য কিছু দাও। আমাদের রাজ্যে এস এস কে এম সাইপ্রোহেপটাডিন- কে গ্যাসট্রো ইনটেস্টনল -এ এন্ট্রি করিয়ে দিল।

আমরা মেমোরান্ডামে তিনটে কথা বলেছি– **ইনএফেক্টিভ বা অকার্যকরী, ইর্‍্যাশনাল বা অযৌক্তিক এবং ব্যান্ড বা নিষিদ্ধ** ড্রাগ। বাজারে এবং সরকারি লিস্টে এমন প্রচুর কম্বিনেশন আছে যা অবৈজ্ঞানিক এবং অযৌক্তিক। যেমন টিনিজাডল এর সাথে ওফ্লক্সাসিন। এটা অযৌক্তিক কিন্তু নিষিদ্ধ নয়। সরকার নিষিদ্ধ করেছে মেট্রোনিজাডল-র সাথে ন্যালিড্যাক্সিক অ্যাসিড। ন্যালিডিক্সিক অ্যাসিড হচ্ছে পেরেন্ট কম্পাউন্ড বা ফার্স্ট কম্পাউন্ড ফর ফ্লুরো কুইনোলন। এটা কেন নিষিদ্ধ হল তার ইতিহাস আছে। যে কোন ডাইরিয়া, ছোট থেকে বড় হিসেব করে দেখা গেছে এর ৭৮% ভাইরাল, ২০% ব্যাকটেরিয়াল এবং ২% প্যারাসাইটিক বা প্রোটোজোয়া ঘটিত। ভাইরাল হলে ওষুধ খেতে হবে না, ও আর এস খেলেই সারবে। ব্যাকটেরিয়াল হলে কি লাগবে? সিপ্রোফ্লক্সাসিন, নরফ্লক্সানি, কোট্রাইমক্সিজল, অ্যামক্সিসিলিন ইত্যাদি। তা হলে ডাক্তার যদি ডায়গনসিস না করতে পারেন তবে ৯৮% কভার হয়ে গেল। আর ২% এর জন্য ওষুধ কোম্পানিগুলি বাজারে সমস্ত রকম কম্বিনেশন রেখেছে। প্লেন নরফ্লক্সাসিন বাজারে প্রায় পাওয়াই যায় না। এটা একটা দারুন সমস্যা। আমাশয় হয়েছে আমি মেট্রোনিডাজল বা টিনিডাজল খাচ্ছি-ইট কিলস্ দ্য ট্রফোজাইট। আর মরে যাওয়ায় সে নিজে থেকেই পায়খানার সাথে সিস্ট হয়ে বেরিয়ে গেল। যে রুগীটা মেট্রোনিডাজল খেলো তার শরীরে সিস্ট কিছু রইল না। তা হলে ওই রুগীকে ড্রাইলক্সোনাইট ফ্লুরেট খাওয়ানোর দরকার কী? ড্রাইলক্সোনাইট ফ্লুরেট সে খাচ্ছে কি জন্য? নিজের জন্য নয়, সোসাইটির জন্য মানে যাদের সমাজ সেই পুঁজিপতিদের জন্য। আর রুগী এটা খেতে বাধ্য হচ্ছে কারণ তুমি কম্বিনেশন ড্রাগে এটা ঢুকিয়ে দিয়েছ। এই হল ইর্‍্যাশনাল ড্রাগের ব্যাপার।

ইন এফেক্টিভ বা অকার্যকরী কী? এই যে ট্রিপসিন, ক্লাইমোট্রিপসন...এগুলো এনজাইম বা উৎসেচক। এনজাইম পাকস্থলিতে গেলে কি হবে? অ্যাসিড দিয়ে তব্ব কার্যকারিতা যাবে। তাহলে কেন এই এনজাইমগুলি রেখে দিয়েছ, কম্বিনেশনে ঢুকিয়ে দিচ্ছ? এগুলো হল ইন এফেক্টিভ। বিভিন্ন ভিটামিন টনিক, হারবাল টনিক হচ্ছে বে-আইনি। পুণম ভার্মা–অশ্বিনী প্যাটেলের কেসে এটা প্রমাণ হয়েছে। ডঃ অশ্বিনী প্যাটেল পুণম ভার্মার স্বামীকে জ্বর হওয়ায় ক্লোরাম ফেনিকল খাইয়েছিল। পুণম ভার্মা যখন স্বামীর মৃত্যুর পর ডিস্ট্রিক কনজিউমার্সে গেল তখন তারা বলল 'এটা তো সব ডাক্তারই প্র্যাকটিস করে'। তিনি ডিস্ট্রিক্স কমিশন, ন্যাশনাল কমিশনে হেরে গেলেন। পুণম সুপ্রীম কোর্টে গেলেন। সুপ্রীম কোর্ট এইমস (AIIMS) ডাক্তারদের নিয়ে কমিটি গড়ল। কমিটি বলল অশ্বিনী প্যাটেল একজন হোমিওপ্যাথির ডাক্তার হিসাবে এই অ্যালোপ্যাথি ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে পারেন না। অশ্বিনী হেরে গেল। তারপর ১৯৯৬ সালে আইন হল 'দ্য ডক্টরস অফ এনি সিস্টেম অফ মেডিনিস আর নট অ্যালাউড টু প্রেসক্রাইব আদার সিস্টেম'। তুমি আলটপকা কোন প্র্যাকটিশ করতে পার না। কিন্তু এই প্র্যাকটিশ চলছে। ফার্মাসিউটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট এই বিষয় সুপারভাইস করছে। তারা এইসব ইনফরমেশন খুব ভালই জানে। কিন্তু আইন প্রয়োগ করলে কোম্পানিগুলোর থেকে পয়সা পাওয়া যাবে না, সরকারের কুদৃষ্টিতে পড়ে সরকারি ডাক্তারদের হয় বদলি হতে হবে নয়ত চাকরি যাবে।

বি. ম ঃ আপনাদের মেমোরান্ডামের ৪.১ বিন্দুতে আপনারা বলেছেন– অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক ওষুধের বাজার ডাক্তারদের বাধ্য করছে অপরিহার্য নয় এমন ওষুধ লিখতে এবং সাধারণ মানুষকে বাধ্য করছে তা গ্রহণ করতে। এটা কিভাবে ও কেন ঘটছে।

ডঃ হীরালাল কোনার ঃ আপনাদের বলা হল বি১, বি৬, বি১২ ভিটামিনগুলোর একসাথে প্রয়োজন হয় না। ধরুন কোন রুগীর বি১ ভিটামিন দরকার। কিন্তু বাজারে শুধু বি১ ভিটামিন পাওয়া যায় না। তখন ডাক্তার এবং রুগী কী করবেন? আমাকে

কম্বিনেশনটাই লিখতে হবে। এইভাবে ডাক্তারদের বাধ্য করা হয় অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক ওষুধ লিখতে আর রুগীও কিনতে বাধ্য হয়। যদি মনে করি কোন রুগীকে অ্যান্টি হিস্টামিন হিসাবে সাইপ্রোহেপটাডিন দেব তখন তা পারি না। বাজারে শুধু সাইপ্রোহেপটাডিন নেই। ফলে আমাকে অযথা কম্বিনেশন ড্রাগ লিখতে হচ্ছে।

ড. স্বপন জানা ঃ এটা একটা ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেম। জনগণ ডাক্তারের ঘাড়ে বন্দুকটা দেয় তার সাথেই তার কনফ্রনটেশন হচ্ছে। আমরা সার্ভে করে দেখেছি – বেশিরভাগ ডাক্তারই যে ওষুধ কোম্পানির পয়সা খেয়ে প্রতারণা করছে তা নয়। তারা বিশ্বাস করে টনিকটায় কাজ হয়। তারা বিশ্বাস করে এই ইর‍্যাশনাল ড্রাগটা ভালো।

ড: আর পি সিং ঃ কিছু ডাক্তার আমাদের এই ল্যাঙ্গুয়েজেই বলে "তোমরা যাই বল তাই বল, তোমরা তো প্র্যাক্টিস কর না, তাই জান না। তোমরা খালি বইপত্র পড়, ছাত্র পড়াও। আর আমরা খেটে খাই।"

বি ম ঃ মেডিকেল ইনসিওরেন্স ব্যবস্থা চিকিৎসায় কি প্রভাব ফেলছে?

ড: স্বপন জানা ঃ আমার পাড়ায় ল্যাবরেটরিতে একটা ছোটখাট রক্ত পরীক্ষা ৩০-৪০ টাকায় হয়। কিন্তু কোন বড় ইনস্টিটিউশনে গেলেই সেটা হয়ে গেল ৬০ টাকা। আপনারা সার্ভে করলে দেখতে পাবেন – ইনসিওরেন্স থাকলে যে রেট পাচ্ছেন, সাধারণ বা ওপেন মার্কেটে তার চেয়ে দাম কম। স্বাস্থ্য বীমা শিল্পের লোকেরা বলছে এটাকে উল্টো করতে হবে। খোলা বাজারে বেশি আর বীমা করলে কম।

ড: কোনার ঃ দেখবেন ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলো এখন সব বেধে দিয়েছে। এই অপারেশনে এর চেয়ে বেশি টাকা দেওয়া যাবে না, হাসপাতাল বা নার্সিংহোম যাই খরচা করুক। বাজারের নিজস্ব দ্বন্দ্বে বা অর্থনীতির নিজস্ব নিয়মে এটা করতে বাধ্য। এর থেকে বেরোবার কোন উপায় নেই। ফেয়ার প্রাইস শপের পলিসিটা কেন্দ্রের আর তা নিয়ে মমতা নিজের বাজনাটা বাজিয়ে দিল। আর সবচেয়ে বড় কথা হল–একটা জায়গায় ৫৬% আর অন্য জায়গায় ৭২% এটা কি করে হল? এন আর এস এ (৬৬%) যে ওষুধ কিনবে সে কম গরীব আর ডেন্টালে (৭২%) যে ওষুধ কিনবে সে বেশি গরীব? এখন লোভ দেখানো হয়। এত ছাড়, তত ছাড়। একটা কিনলে একটা ফ্রি...

বি. ম ঃ কোম্পানিগুলোর স্টক ক্লিয়ার করার নীতি–

ড: আর পি সিং ঃ না এটা কনজিউমারিজম। আমার একটা প্রয়োজন কিন্তু লোভ দেখিয়ে দুটো কেনান হচ্ছে। একটা সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে।

ড: কোনার ঃ আর এই করেই আসলে মার্কেটটাকে ধরা হচ্ছে। আর ওষুধের যেটা প্রকৃত দাম সেই দামে কোথাও বিক্রি হচ্ছে না। বার বার জেনেরিক নামে ওষুধ লিখতে বললেও তা কোথাও বিক্রি হচ্ছে না।

ড: আর পি সিং ঃ সবচেয়ে বড় দ্বিচারিতা হল–সুপারিনটেন্ডেনকে দিয়ে বলা হচ্ছে জেনেরিক নামে ছাড়া কেউ ওষুধ লিখলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। আমি জেনেরিক নামে ওষুধ লিখলাম আর পেশেন্ট যখন ওষুধ আনল তখন দেখছি তা ব্র্যান্ড নেমে অ্যাপ্রুভড বাই দ্য গর্ভমেন্ট। তবে আমাকে কেন জেনেরিক নামে ওষুধ লিখতে বাধ্য করছ? এক চড় মারতে হয় না ডি এইচ এস কে?

ড: জানা ঃ ঠিক তাই। এক চড় মারতে হয়, তাতে শাস্তি যাই হোক।

ড: কোনার ঃ এখানে একটা খেলা আছে। আমি জেনেরিক নামে লিখছি আর এফ পি এস থেকে দোকানদার পছন্দমত ব্র্যান্ড নামে ওষুধ দিচ্ছে। কোম্পানি, সরকার, রুলিং পার্টি আর দোকানদারের চয়েসের ব্র্যান্ড বিক্রি হচ্ছে। আগে ডাক্তাররা পছন্দমত ব্র্যান্ডের ওষুধ সরকারি হাসপাতালের লিখতে পারত। এখন ঘুরিয়ে সেই স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

ড: আর পি সিং ঃ সারা ভারতে প্রচার হচ্ছে–পশ্চিমবঙ্গ একটা মডেল, এখানে ন্যায্যমূল্যের ওষুধ সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়।

ড: জানা ঃ সরকার কাগজ বা প্রচারমাধ্যমকে দিয়ে বলালো আমরা জনগণের কত কোটি টাকা সেভ করে দিচ্ছি। কিন্তু কত কোটি টাকা লুণ্ঠন হচ্ছে তা উহ্য থেকে যাচ্ছে।

ড: আর পি সিং ঃ কোন ফেয়ার প্রাইস শপ দেখাতে পারবে তারা কত টাকায় কোন ওষুধ কিনেছে? পারবে না। কত দামে বিক্রি করছে তা দেখাচ্ছে।

ড: জানা ঃ সরকারি দলের অনুমতি ছাড়া কোন ড্রাগ ইনসপেক্ট এফ পি এস-এ ঢুকতে পারবে না। একটা উদাহরণ দেই। সেট্রিজিন– দাম ছাপা আছে ৩৫ টাকা। ফেয়ার প্রাইস শপ কিনছে ১০ টা ট্যাবলেট ১.৫০ টাকায়। সুতরাং ১০মিলিগ্রামের একটা ট্যাবলেটের দাম পড়ছে ১৫ পয়সা। কোম্পানি ১৫ পয়সা করে ট্যাবলেট বিক্রি করেই প্রচুর লাভ

করছে। দোকানদার ৩৫ টাকায় ৭০% ছাড় দিলেও ১০ টাকা ৫০ পয়সায় বেচে ১০ টা ট্যাবলেটে ৯ টাকা মানে ৬০০ শতাংশ লাভ করছে। এখানে আলাদা করে ভেজাল দেওয়ার দরকারটা কী? আর ভেজাল কে না দেয়? কেউ কেউ প্রচার করছে ফেয়ার প্রাইস শপের ওষুধে ভেজাল। ভবিষ্যতে এই ভেজাল ধরার অভিযানের নামে বিরাট আকারের ইনভেস্টমেন্ট করবে হয়ত। ভারতবর্ষে ভেজালের যা ইতিহাস তাতে বেশিরভাগ ভেজাল দেয় বড় কোম্পানি। র‍্যানব্যাক্সি, জি এস কে, ফাইজার, অ্যাবট... । মনে রাখবেন আট আনা এক টাকায় ভেজাল হয় না ভেজাল হয় ৫০০ টাকা ১০০০ টাকা নোটে। আমার কাছে সিরিজ অফ অ্যালবেন্ডাজল আছে যার গায়ে দাম ২২ টাকা, ৩২ টাকা লেখা আছে। এগুলো কোয়াক ডাক্তাররা ৪ টাকা, ৫ টাকায় কিনতে পারে। ফেয়ার প্রাইস শপে অনেক বেশি দাম পড়বে। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারি না।

বি. ম ঃ প্রাইভেট ডাক্তাররা বলছেন এফ পি এস এর ওষুধে ভেজাল, গুণমান খারাপ, বাইরের দোকানের মাল ভাল। অনেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও তাই। কি বলবেন?

ড: কোনার ঃ এরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। প্রমাণ ছাড়া কিছু বলা যায় না। কম দামের ওষুধ মানেই ভেজাল – বড় কোম্পানিগুলো এই সংস্কৃতি মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

ড: ফণী মন্ডল ঃ একটা কথা মাথায় রাখতে হবে। সব ডাক্তাররা যে সাধুপুরুষ তা ভাবার কোন কারণ নেই। ডাক্তাররা যে ব্র্যান্ড নেমে ওষুধ লেখে সেই কোম্পানি/ডিসট্রিবিউটরের থেকে মাসের শেষে মোটা খাম চলে আসে। এর জন্য সরকারি হাসপাতালেও ডাক্তারদের মধ্যে প্রেসক্রিপশন করার জন্য মারপিটও লেগে যায়।

ড: জানা ঃ একটা উদাহরণ দেই। এক ডাক্তারি ছাত্র (ইন্টার্নি) একজন রুগীকে সালবুটামল ওষুধ দিয়েছে। সকালে সে একটা কোম্পানির ব্র্যান্ড নেমে আর বিকালে অন্য কোম্পানির ব্র্যান্ড নেমে। প্রথমে আমরা ভেবেছি সে ভুল করে লিখেছে। পরে তদন্ত করে জানা গেল–ভুল নয়, সে একসাথে দুটো কোম্পানিকে সার্ভ করছে। এটা সত্যি যে বহু ডাক্তার কোম্পানির থেকে পয়সা নিচ্ছে, গাড়ি, ফ্রিজ কত কী? তবে হয়ত সবাই নয়। আমি বলতে চাইছি এগুলো ক্যাপিটালিস্ট বা পুঁজিবাদী অর্থনীতির ফল। পুঁজিবাদে সব কিছুর মধ্যে মুনাফার প্রশ্ন আছে। এখানে ডাক্তাররাও মুনাফার বাইরে থাকতে পারে না, ওষুধের দোকান মুনাফা ছাড়া থাকতে পারে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে মুছে ফেলা ছাড়া এর সমাধান নেই। পুঁজিবাদী সিস্টেমটাই মানুষের উন্নতির বাধা। তাই এই সিস্টেমকে মোছা ছাড়া কোন উপায় নেই।

বি. ম ঃ ওষুধ তো একটা পণ্য। এর দাম দোকানদার ঠিক করে না। বাজার অনুযায়ী ওষুধ কোম্পানিগুলো ঠিক করে। ৬০%, ৭০% ডিসকাউন্ট না দিয়ে এম আর পি যদি কম রাখত, তা হলেও তো লাভটা ঠিকই থাকতো। তা হলে তারা এমন করে কেন?

ড: জানা ঃ আপনি ঠিকই ধরেছেন। ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার (ডি পি সি ও) ১৯৭৮ সাল থেকে ৩৫০ টার কাছাকাছি মলিকুল এর দাম নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করল। এটা যে ভারত সরকার করল 'ফর দ্য পিওপল' তা নয়। এর পিছনে তৎকালীন সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের চাপ ছিল। সে ওষুধের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য এটা করাল। তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পিছু হঠছে। এখন আবার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখন ডমিনেট করছে তখন সে বলছে দামের উপর নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে দাও। তখন ডি পি সি ও দামের ক্যালকুলেশনের একটা হিসাব দিয়েছিল যেটা 'ড্রাগস ল' তে পেয়ে যাবেন। এখন আর সেটা মানা হয় না।

বি. ম ঃ আমরা দেখছি দু-চার বছর অন্তর বিভিন্ন ড্রাগ ডি পি সি ও-র আন্ডারে চলে যায়। তারপর দেখা যায় সেগুলো আর বাজারে পাওয়া যায় না। যেমন কেট্রাইমক্সিজল ডি এস, একসময় তা বাজারে মুড়িমুড়কির মত চলত। যেই হায়ার জেনারেশন এসে গেছে ওমনি ওই ড্রাগ ডি পি সি ও-র আন্ডারে চলে গিয়ে বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল। তবে কি বেশি দামের নতুন মলিকুল আনার জন্য পুরানো প্রোডাক্টগুলোকে ডি পি সি ও-র আন্ডারে ফেলা হচ্ছে।

ড: জানা ঃ হ্যাঁ, এটা শুধু ডি পি সি ও-র প্রশ্ন নয়। কেট্রাইমক্সিজল সস্তায় বাজারে পাওয়া গেলে ফ্লুরো-কুইনোলন বাজারে ঢুকতে পারবে না। এটা করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত পন্থা নেওয়া হল। রুগীর ইউরিন কালচার করার সময় কেট্রাইমক্সিজল এত বেশি পরিমাণ দেওয়া হচ্ছে যাতে ওই ড্রাগটা রেজিস্টানট দেখাচ্ছে। এভাবে ফ্লুরো-কুইনোনলন-এর মার্কেটে ঢোকা সহজ হল। আমি এতবছর চিকিৎসা করছি। আজ পর্যন্ত এসেনসিয়াল ড্রাগ লিস্টের বাইরে কোন ওষুধ লিখিনি। তা হলে আমার রুগীদের রোগ সারছে কি ভাবে?

বি. মঃ ডি পি সি ও-র আন্ডারে যে ড্রাগগুলো পড়ে তার কোম্পানিগুলি সেখানে বিনিয়োগ করতে চায় না। তবে কি

কোম্পানিগুলোর হায়ার জেনারেশনের মার্কেট করতে ডি পি সি ও কি সাহায্য করছে না?

ডঃ কোনার ঃ ডি পি সি ও- তে যেটা চলছে সেটা তো সরকার, মানে গর্ভমেন্ট কমান্ড বাই মার্কেট। সরকারের নিজস্ব কোন কর্তৃত্ব নেই।

বি. ম ঃ যে ওষুধগুলো সরকারিভাবে নিষিদ্ধ সেগুলো উৎপাদন হচ্ছে কিভাবে?

ডঃ জানা ঃ ধরুন A+B+C মলিকুলের কম্বিনেশন নিষিদ্ধ, কিন্তু যেই তার সাথে X মিশিয়ে দিয়ে A+B+C+X কম্বিনেশন বানালাম ওমনি তা আর সরকারিভাবে নিষিদ্ধ থাকছে না।

ডঃ কোনার ঃ এর গল্পগুলো জটিল। ওষুধের মধ্যে হাইড্রক্সিল গ্রুপ-কে একটু এদিক ওদিক করে দিলে হয়ত ওষুধের কার্যকারিতা পাল্টায় না। এটা করলেই তা নিষেদ্ধের তালিকা থেকে বেড়িয়ে আসছে। উৎপাদন করা যাচ্ছে। বিক্রি হচ্ছে।

বি. ম ঃ যেমন ধরুন অ্যাসিক্লোফেনাক ১০০ আর প্যারাসিটামল ৫০০ মি.গ্রাম কম্বিনেশন বাজারে চলছিল। গত মার্চ থেকে অ্যাসিক্লোফেনাক ১০০ আর প্যারাসিটামল ৩২৫ মি.গ্রা কম্বিনেশন এসেছে। বলা হচ্ছে এটা র‍্যাশনাল ড্রাগ।

ডঃ জানা ঃ আরে এই দুটো একসাথে করাটাই তো ইর‍্যাশনাল। আপনাদের আর একটা বিষয় জানাই। জাপানি এনসেফালাইটিসের যে টীকা দেওয়া হচ্ছে তার প্রয়োগে চীনে প্রতিবছর ১০ হাজার লোক মরছে। এটা টেক্সট বুকে আছে। ওদেশের বাইরে কত মরছে কে জানে? অথচ আমাদের দেশে এই চীনা টীকাই দেওয়া হচ্ছে।

বি. ম ঃ ওষুধের ব্যবসা তো বাজার অর্থনীতির নিয়মে চলছে। এই ব্যবস্থায় আপনাদের প্রতিবাদ কতটা সফল হবে?

ডঃ জানা ঃ আমরা কিছুই সাফল্য পাব না। ১৯৮৬ সাল থেকে আমি ড্রাগ অ্যাকসন ফোরামের সাথে যুক্ত। তখন যা চিত্র ছিল অবস্থা এখন তার চাইতে অনেক ভয়াবহ। ওষুধ নিয়ে আন্দোলন, মানবাধিকার আন্দোলন 'কুকুরের ল্যাজ সোজা করার আন্দোলন'।

ডঃ আর পি সিং ঃ আমরা এবং প্রতিপক্ষ– ক্ষমতার ব্যবধান মারাত্মক। প্রতিপক্ষ অনেক, অনেক বেশি শক্তিশালী। এটা আপনাদের ধারণার বাইরে।

ডঃ কোনার ঃ আমি একটু ভিন্ন মত পোষণ করছি। রাজনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া সফল হব না এটা যেমন সত্যি কিন্তু ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম বা এই ধরণের আন্দোলন যেটা করেছে, যে অ্যাওয়রনেন্স-এর কাজ করেছে তার মূল্যও কম নয়। আপনারা আজ আমাদের প্রশ্ন করছেন, একটা ভাবনার জন্ম হয়েছে এটা তো এইসব কাজে ফল। পশ্চিমবঙ্গে এতকাল ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম এই ব্যাপারগুলো সামনে এনেছে বলেই তো প্রশ্নগুলো আপনাদের মাথায় এসেছে।

বি. ম ঃ আপনি বললেন রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন না হলে এটা সম্ভব নয়। পশ্চিমবাংলায় তো কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, তৃণমূল–ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে। আগামীতে হয়ত বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। এই পরিবর্তনে কি সমস্যার সমাধান হবে?

ডঃ কোনার ঃ না, কখনও সম্ভব নয়।

ডঃ আর পি সিং ঃ সম্ভব নয়।

ডঃ জানা ঃ এরা সকলেই বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি। এ আম্বানির তো ও টাটার, এ হাফ আম্বানি হাফ টাটা, আরও কত কী! সংসদীয় গণতন্ত্র সাধারণ মানুষের স্বার্থ সেবা করে না। আর মনে রাখবেন মানব সভ্যতার ইতিহাসে বুর্জোয়ারা কখনও নিজেদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বন্ধুত্ব করে না। প্রয়োজনে একে অপরের সাথে গাটছড়া বাঁধে আর প্রয়োজন ফুরোলে তা ভেঙেও দেয়। পুঁজিবাদ সকলের রক্ত চুষে খায়, উদবৃত্ত মূল্য শোষণ করে খায়। এদের মধ্যে দ্বন্দ্বটাই প্রধান।

বি. ম ঃ তবে কি এখন সময়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে? এখন কি শুধুই অ্যাওয়ারনেস?

ডঃ জানা ঃ অন্ততঃ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তাই।

ডঃ আর পি সিং ঃ আমরা ঘরে বসে বড় বড় কথা বলি। আমাদের কথা কতজন মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে পারছি?

ডঃ কোনার ঃ আমাদের প্রধান দুর্বলতা হল, একটা ঘটনা ঘটলে প্রচন্ড চেচামেচি করি একদিন কি দু-চারদিন। প্রতিবাদ করি, মিছিল করি। তারপরই চুপ। ধারবাহিকতার প্রবল অভাব। এই ধারাবহিক কাজটাই করতে হবে। আপনাদের উদ্যোগকেও সাধুবাদ।

বি. ম ঃ আজ আপনাদের সাথে কথা বলে অনেক বিষয় পরিষ্কার হল। সমাজের ব্যাপক মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে, সামাজিক অসাম্যের কারণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত বক্তব্য নিয়ে যাওয়ার অতি ক্ষুদ্র প্রয়াস রাখছি। আশাকরি ভবিষ্যতেও আপনাদের সহযোগিতা পাব। ধন্যবাদ।■

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ

‘ফিলি’র ধূমকেতু-বিজয়

ধূমকেতু হল ধূলো, বরফ ও গ্যাসের তৈরি এক ধরনের মহাজাগতিক বস্তু। ধূমকেতু একটি ক্ষুদ্র বরফাবৃত সৌরজাগতিক বস্তু যা সূর্যের খুব নিকট দিয়ে পরিভ্রমণ করার সময় দর্শনীয় কমা (একটি পাতলা, ক্ষণস্থায়ী বায়ুমন্ডল) এবং কখনও লেজও প্রদর্শন করে। ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের ওপর সূর্যের বিকিরণ ও সৌরবায়ুর প্রভাবের কারণে এমনটি ঘটে। ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস বরফ, ধূলা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথুরে কণিকার একটি দুর্বল সংকলনে গঠিত। প্রস্থে কয়েকশ মিটার থেকে দশ কি.মি এবং লেজ দৈর্ঘ্যে কয়েকশ কোটি কি.মি পর্যন্ত হতে পারে। মানুষ সুপ্রাচীন কাল থেকে ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করছে।

একটি ধূমকেতুর পর্যায়কাল কয়েক বছর থেকে শুরু করে কয়েকশ’ হাজার বছর পর্যন্ত হতে পারে। ধারণা করা হয় স্বল্পকালীন ধূমকেতুর উৎপত্তিকুইপার বেল্ট থেকে যার অবস্থান নেপচুনের কক্ষপথের বাইরে এবং দীর্ঘকালীন ধূমকেতুর উৎপত্তি ওরট মেঘ থেকে, যা সৌরজগতের বাইরে বরফময় বস্তুর গোলাকার মেঘ। আমাদের সৌর জগতের বড় গ্রহগুলোর (বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন) অথবা সৌরজগতের খুব কাছ দিয়ে পরিক্রমণকারী নক্ষত্রের কারণে ওরট মেঘে যে মাধ্যাকর্ষণবল ক্রিয়া করে তাতে বস্তুগুলো সূর্যের দিকে ছুটে আসে এবং তখনি কমার উৎপত্তি হলে আমরা ধূমকেতু দেখি। বিরল কিছু ধূমকেতু অধিবৃত্তাকার কক্ষপথে সৌরজগতের ভেতরে প্রবেশ করে এসব গ্রহের মাধ্যমে আন্তনাক্ষত্রিক স্থানে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

ধূমকেতু উল্কা বা গ্রহাণু থেকে পৃথক কারণ এর কমা ও লেজের উপস্থিতি। কিছু বিরল ধূমকেতু সূর্যের নিকট দিয়ে বারবার পরিভ্রমণ করার কারণে উদ্বায়ী বরফ ও ধূলা হারিয়ে ছোট গ্রহাণুর মত বস্তুতে পরিণত হয়।

ধূমকেতু’র বিষয়ে মানুষের জিজ্ঞাসার কোন শেষ নেই। ‘ধূমকেতু’ কথাটার মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটা ভয় মিশ্রিত রহস্য। এটা কি খসে পড়া তারা, নাকি ভিনগ্রহের মানুষের চেয়েও কোন বুদ্ধিমান জীব জগতের পাঠানো যান? একদা মানুষ মনে করত ধূমকেতু হল অশুভের ইঙ্গিত, ধ্বংসের প্রতীক। তাই একে ঘিরে একদিকে যেমন প্রচলিত রয়েছে হাজারো কুসংস্কার, অন্যদিকে রয়েছে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এর রহস্য ভেদ করার প্রবল বাসনা। আসলে ধূমকেতুর ঝাঁটার মতো অদ্ভুত আকৃতিটাই হ’ল এর পিছনে কুসংস্কার বা রহস্যের উৎস। এই আকৃতির জন্যই ধূমকেতু অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুমন্ডলী থেকে একদম আলাদা ও রহস্যঘন।

এই রহস্যের জাল উন্মোচনের লক্ষ্যে সম্প্রতি মহাকাশ বিজ্ঞানের আঙিনায় ঘটে গেছে এক বৈপ্লবিক ঘটনা। মনুষ্যনির্মিত মহাকাশ যান ‘রোসেটা’র সাহায্যে ‘ফিলি’ নামক অবতোরণকারী যন্ত্রটি সোজা গিয়ে বসে পড়েছে একটি ধূমকেতুর শরীরে। ধূমকেতুর নাম 67P/Churyumov - Gerasimenko, সংক্ষেপে 67P/C-G. ইউরোপীয়ান সোর্স এজেন্সী (ই এস এ) ও ‘নাসা’র যৌথ উদ্যোগে গত ১২ই নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ইউরোপীয় সময় সকাল ১১ টায় ‘ফিলি’ ধূমকেতুটির উপর অবতরণ করে। এর প্রায় ১৫ দিন আগেই ‘রোসেটা’ মহাকাশ যানটি ‘সি-জি’ ধূমকেতুর কক্ষপথে পৌঁছে যায় ও অবতরণের জন্য জায়গা বাছতে থাকে। অবশেষে ৩রা নভেম্বর অবতরণের স্থান নির্দিষ্ট বলে বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেন। ১২ই নভেম্বর ঘটতে চলেছে মহাকাশ গবেষণার সেই উজ্জ্বলতম ঘটনাটি। তাৎপর্য্যের দিক থেকে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এটা চন্দ্রবিজয় বা মঙ্গলবিজয়ের থেকে কোন অংশে কম নয়। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা অধিক তাৎপর্য্যপূর্ণ। গত দশ বছরে প্রায় ৩১৭ মিলিয়ন মাইল বা প্রায় ৫১০ মিলিয়ন কিমি পথ অতিক্রম করে প্রায় ২৯০০ কেজি ওজনের মহাকাশ যানটি বর্তমানে ধূমকেতুটির কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত। প্রদক্ষিণকালে সেটি অবতরণযান ফিলির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে ও অবিরত ছবি ও তথ্য পাঠিয়ে চলেছে পৃথিবীতে। অবতরণের সময় ১০০ কেজি ওজনের যান ‘ফিলি’ বার দুয়েক ঝাঁকুনি খায়। বৈজ্ঞানিকরা আশঙ্কা করে ছিল এর ফলে ‘ফিলি’র যন্ত্রপাতিগুলি বিকল না হয়ে যায়। পরে বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ পান যে ১০০ কেজি ওজনের

অবতরণ যানটিতে যে ১০টি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি রয়েছে তার প্রত্যেকটি সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। এই যন্ত্রপাতিগুলির মধ্যে কয়েকটি হল ঃ

* uv imaging spectrometer

* comet nucleus sounding

* comet secondary ion mass analyser

* visible and inafrared Mapping Spectrometer, ইত্যাদি।

এই যন্ত্রগুলির সাহায্যে যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালনো হবে বা হচ্ছে তা হল ঃ

* ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস ও তার অন্যান্য অংশকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা ও তার চিত্র গ্রহণ করা।

* ধূমকেতু নিউক্লিয়াস হতে কমা'র উৎপত্তিমূলকে পর্যবেক্ষণ করা।

* ধূমকেতুর কমা ও লেজের মধ্যে যে অসংখ্য মহাজাগতিক ধূলিকণা ও গ্যাস রয়েছে তার প্রকৃতি নির্ণয় করা।

* ধূমকেতুর বরফাবৃত শরীরে জৈবপদার্থের (যথা অ্যামিনো অ্যাসিড)-এর সন্ধান করা এবং এর মাধ্যমে ধূমকেতু জীবনের বীজ বহন করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।

* পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবে ধূমকেতুর কোন ভূমিকা আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।

* সূর্যের খুব কাছাকাছি (পেরিহিলিয়ন) ভ্রমণকালে ধূমকেতুর কি কি পরিবর্তন হয় তা পর্যবেক্ষণ করা। সেই তথ্য হতে সূর্যকেও খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করার সুযোগ পাবে 'ফিলি'।

ইতিমধ্যে ধূমকেতুর পরিমন্ডলে যে সমস্ত গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে তা হল ঃ জল, কার্বন-মনো-অক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, মিথেন, মিথাইল অ্যালকোহল অর্থাৎ জৈব পদার্থের সন্ধান ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন।

যাইহোক, ধূমকেতু সি-জি'র ঘাড়ে চেপে 'ফিলি'র এই অভিযান আগামীদিনে সমৃদ্ধ করবে মহাকাশ বিজ্ঞানকে, সমৃদ্ধ করবে আমাদের জ্ঞানের ভান্ডার। সেই সঙ্গে দূর হবে ধূমকেতু নিয়ে টিকে থাকা যত কুসংস্কার, যত অবৈজ্ঞানিক ধারণা।■

(তথ্য সূত্র ঃ উইকিপিডিয়া, ইএসএ, এনএএসএ)

●২৭ *পৃষ্ঠার পর*

সৃষ্টিশীলতা কি 'ঈশ্বরপ্রদত্ত' ?

সৃষ্টিশীল মূহুর্তে মস্তিষ্কের যে সব অংশের নেটওয়ার্ক সক্রিয় হয়ে ওঠে সেগুলি ডান ও বাম দুই গোলার্ধ জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে। অর্থাৎ শৈল্পিক ক্ষমতার বিকাশে বাম মস্তিষ্কেরও অবদান রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। গবেষকরা জানিয়েছেন, তাঁদের পাঁচ বছরের পরীক্ষায় যে ফলাফল পাওয়া গেছে, তার ফলে সৃষ্টিশীলতা আর রহস্যজনক বা 'ঈশ্বরপ্রদত্ত' থাকবে না। কেবলমাত্র প্রশিক্ষণ দিয়েই শিশুদের সৃষ্টিশীল করে তোলা যাবে। Nuropsychology and Cogrnitive nuroscience unit এর সহকারী অধ্যাপক ডঃ যমুনা রাজেশ্বরন-এর কথায় 'আমাদের পরীক্ষায় এই আভাস মিলেছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৃষ্টিশীল কাজ করার ক্ষমতার জন্য মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ একযোগে এই নেটওয়ার্ক তৈরি ক'রে কাজ করে। মস্তিষ্কের ডান ও বাম গোলার্ধের মধ্যে সমন্বয় যত ভাল হয়, সেই ক্ষমতা ততই বাড়ে।' National Centre for Biological Sciences -এর অধ্যাপক ডঃ সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, সৃষ্টিশীলতার সংজ্ঞা এখনও মানুষ পায়নি। সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও পরিবেশেরও ভূমিকা রয়েছে, কারণ সেগুলোও মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে।"

গবেষণার ফলাফল নিঃসন্দেহে বস্তুবাদী দর্শনকে উর্দ্ধে তুলে ধরে। অন্যদিকে ভাববাদী দর্শনকে নাকচ করে। নাকচ করে সৃষ্টিশীলতার পিছনে ঈশ্বরীয় তত্ত্বকে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সকল মানুষকে সমান সুযোগ ও পরিবেশ প্রদান করা সম্ভব নয় তাই সকল মানুষের মধ্যেই যে কোন না কোন বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা রয়েছে তা এই ব্যবস্থায় প্রমাণ করাও সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমাজের প্রত্যেক মানুষের সৃষ্টিশীলতার প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে, বড় বড় আর্ট গ্যালারিতে মাঠের কৃষক বা কারখানার শ্রমিকরা দলে দলে আসেন। অর্থ্যাৎ ওই সমাজে শ্রমিক-কষক দেরও সৃষ্টিশীল ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। বর্তমান ব্যবস্থার এই অক্ষমতা, সমাজ পরিচালকরা স্বীকার করে না তাই বিজ্ঞান যতই বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদকে উর্দ্ধে তুলে ধরুক না কেন, তাদের টিকে থাকার স্বার্থেই তারা ভাববাদকে টিকিয়ে রাখবে।■

(সূত্র ঃ এই সময়)

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ

বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ ২০১৪

এই বছর অর্থাৎ ২০১৪ সালে পদার্থ বিদ্যায় জাপানের মেইজো ইউনিভার্সিটি ও নাগোয়া ইউনিভার্সিটি-র অধ্যাপক তথা বিজ্ঞানী 'ইসামু আকাসাকি', নাগোয়া ইউনিভার্সিটিরই অপর অধ্যাপক তথা বিজ্ঞানী 'হিরোসি আমানো' ও আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক তথা বিজ্ঞানী শুজি নাকামুরা-কে যৌথভাবে ১৯৯০-র শুরুর দিকে নীল রঙের এল.ই.ডি অর্থাৎ লাইট এমিটিং ডায়োড আবিষ্কারের জন্য নোবেল সম্মানে ভূষিত করা হলো। ১৯৬০ এর দশকে লাল এবং সবুজ আলোর এল.ই.ডি আবিষ্কার হলেও সাদা আলোর এল.ই.ডি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নীল আলোর এল.ই.ডি আবিষ্কার না হওয়ায় সাদা আলোর এল.ই.ডি-র উৎপাদন সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু ১৯৯০-এর দশকে নীল আলোর এল.ই.ডি-র আবিষ্কারের সাথে সাথে সাদা আলোর এল.ই.ডি উৎপাদনের পথ সুগম হয়। আর বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত বাল্ব বা ফ্লুওরোসেন্ট ল্যাম্পের তুলনায় সাদা আলোর এল.ই.ডি-র উজ্জ্বলতা, যা ল্যুমেন দ্বারা পরিমাপ করা হয়, তা অনেক বেশি ও এই সাদা আলোর এল.ই.ডি-র আয়ূষ্কালও বাল্বের থেকে ১০০ গুণ ও ফ্লুওরোমন্ট আলোর থেকে অন্ততঃ ১০ গুণ বেশি। পৃথিবীর মোট বৈদ্যুতিক খরচের এক চতুর্থাংশ খরচ হয় আলো পাওয়ার জন্য। তাই এই আবিষ্কার সত্যিই বৈদ্যুতিক শক্তির সাশ্রয় করবে। কিন্তু এইখানে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই সকলের মনে জাগে তা হলো প্রায় ২০-২৫ বছর আগে আবিস্কৃত ও সেই আবিষ্কারের প্রয়োগও যেখানে সফল ভাবে চালু হয়ে গেছে সেখানে এত বছর পরে কেন এই আবিষ্কারকে নোবেল সম্মানে ভূষিত করা হলো? মানবজীবনে কাজে লাগে ও অনন্য সাধারণ আবিষ্কারের জন্যই তো নোবেল পুরস্কার। সেখানে নীল রঙের এল.ই.ডি-র আবিষ্কার ২০১৪ সালে তো মোটেই অনন্য সাধারণ ব্যাপার নয়। তাই এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে–যে সাদা আলোর এল.ই.ডি-র বাজার ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছে সেই বাজারে কি জোয়ার আনার জন্যই এই বছরে পদার্থবিদ্যায় নোবেল? পুঁজিবাদী মুনাফাখোরী ব্যবস্থায় আসলে সবই বাজারের জন্য তাই নোবেল পুরস্কার ও যে তার বাইরে নয় তা এই পুরস্কার প্রমাণ করল।

এ বছর রসায়নে আমেরিকার জানেলিয়া রিসার্চ ক্যাম্পাসে এরিক বেটজিগ, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি-র উইলিয়াম মোরনার ও জার্মানির ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইন্সটিটিউট ফর বায়োফিজিক্যাল কেমিস্ট্রে-র স্টেফান হেল কে অপটিকাল মাইক্রোস্কোপের সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য নোবেল সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপের এই সীমাবদ্ধতা দূর করার ফলে ন্যানোস্কোপী গবেষণার ক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত হয়েছে। ন্যানোস্কোপী গবেষণার দ্বারা মস্তিষ্কের নার্ভ-কোষগুলির মধ্যে কিভাবে বিভিন্ন অনু সাইন্যাপস তৈরি করে বা পারকিনসন, অ্যালজাইমার বা হানিংটনস-এর মতো রোগগুলির ক্ষেত্রে প্রোটিন কিভাবে যুক্ত হয় তা জানা যায়। কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে এই তিন বিজ্ঞানীর আবিষ্কারও এই বছরের নিরীখে মৌলিক নয়। ২০০৪ সালে স্টেফান হেল স্টিমুলেটেড এমিশান ডিপ্লেশান পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। পদ্ধতি দ্বারা দুটি লেসার বীমের একটি দ্বারা প্রথমে গবেষণায় ব্যবহৃত বস্তু বা পদার্থের সবকটি অণুকে উত্তেজিত করা হয় ফলে সবকটি অনু প্রজ্জ্বলিত হয় ও অপর লেসার বীম দ্বারা ন্যানোমিটার-এর চেয়ে বেশি অনুগুলির প্রজ্জ্বলন বন্ধ করে দেয় ফলে ন্যানোমিটার বা তার থেকে ছোটো অনুগুলি প্রজ্জ্বলিত অবস্থাতেই থাকে এবং এদেরকে সহজেই চিহ্নিত করণ সম্ভব হয়। এরপর ২০০৬ সালে বেটজিগ ও মোরনার সিঙ্গল মলিকিউল মাইক্রোস্কোপী পদ্ধতিটির আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিতে একই ক্ষেত্র-র মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনুদের বারং বার চিত্র বা ইমেজ নিতে হয় এবং এর পরে সুপার ইম্পোজে মাধ্যমে আরও ঘন থেকে ঘনতর সুপার ইম্পোজ তৈরি করা হয় যার ফলে ন্যানোস্তর পর্যন্ত অনুগুলির চিত্র পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। এখন প্রশ্ন হলো ২০০৪ সালে স্টেফান হেল-এর আবিষ্কার ও ২০০৬-এর বেটজিগ ও মোরনার-এর আবিষ্কার এর প্রেক্ষিতে ২০১৪ সালের এই

আবিষ্কার নতুন কোনও আবিষ্কার তো নয়ই এবং আবিষ্কারের প্রকৃতি দেখে পরিষ্কার যে এটি নিখাদ রসায়নেরও আবিষ্কার নয় বা এর দ্বারা আবিস্কৃত ফলও রসায়ন-বিদ্যার মাধ্যমে মানব কল্যাণে নিয়োজিত নয়। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে অ্যালজাইমার ও পারিকনসন রুগী বাড়ছে। এদের চিকিৎসায় ন্যানোস্কোপির ব্যবহার বাড়াতে ব্যবসায়িক যোগ কি তিন বিজ্ঞানীকে নোবেল দেওয়া কারণ? তাই রসায়ন-এও এইবারের নোবেল পুরস্কার প্রশ্নের উর্দ্ধে রইলো না।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে এবছর ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডনের বিজ্ঞানী জন ও' কেফি এবং এডিনবরা ইউনির্ভার্সিটির মনোবিদ ও বিজ্ঞানী মে ব্রিট মোজার কে এবং এডওয়ার্ড মোজারকে মস্তিষ্কের জি.পি.এস বা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি বর্তমানে কোথায় রয়েছে, কোথায় যেতে চান বা তিনি কি করছেন ইত্যাদি খুঁটিনাটি মস্তিষ্ক কিভাবে মনে রাখে তা আবিষ্কারের জন্য নোবেল সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। ১৯৬০-এর দশকে ও' কেফি 'আমাদের মস্তিষ্ক কিভাবে আমাদের আচরণ বিধি নিয়ন্ত্রণ করে ও সিদ্ধান্ত নেয়' সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা শুরু করেন এবং একটি ঘরে একটি ইঁদুরকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গেলে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন ইঁদুরটির নির্দিষ্ট কিছু নার্ভকোষ সক্রিয় হয়ে উঠছে এর মাধ্যমে তিনি মস্তিষ্কের হিপ্পোক্যাম্পাস যা বিভিন্ন নার্ভকোষ থেকে আগত সিগন্যাল কে ধরে রাখে, তার মধ্যে 'প্লেস সেল'-এর উপস্থিতি আবিষ্কার করেন। এই প্লেস সেলগুলিরই নির্দিষ্ট সমন্বয়ই পারিপার্শ্বিক পরিবেশের স্মৃতি ধরে রাখে। কিন্তু ত্রিমাত্রিক দুনিয়ায় প্রাণীটির নির্দিষ্ট অবস্থান চিনিয়ে দিতে পারে না 'প্লেস সেল' বরং এই কাজটি করে 'গ্রিড সেল' আর এই 'গ্রিড সেল' মস্তিষ্কের 'এনটোরহিনাল কর্টেস্কে' থাকে। এডওয়ার্ড ও সে-বিট্রি মোজার এই গ্রিড সেল আবিষ্কার করেন ও 'হিপ্পোক্যাম্পাসের সাথে 'এনটোর হিনাল কর্টেস্কে'-র সমন্বয়ে কিভাবে কোনও প্রাণী তার পারিপার্শ্বিক অবস্থান চিনতে পারে ও মস্তিষ্কে তা সঞ্চিত করে রাখে সেটিও আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারটি স্মৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে এবং ২০১৪ সালের নিরিখে এটি একটি মৌলিক আবিষ্কার যদিও এর চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল ১৯৬০-এর দশকে এবং সম্পন্ন হলো এই বছরই।■

চিঠিপত্র ঃ

মাননীয় সম্পাদক, সমীক্ষণ

মহাশয়,

আপনাদের পত্রিকা 'সমীক্ষণ'-এর ৪র্থ বর্ষ সংখ্যা ২-এ 'ছন্দা গায়েন' শীর্ষকে লেখা রচনাটির মধ্যে তথ্যগত কয়েকটি সংশোধনের প্রয়োজন আছে। আর সেগুলি হলো

১) পর্বতারোহী-র নাম হবে 'জর্জ ম্যালোরি' 'জর্জ মইলি' নয়।

২) জর্জ ম্যালোরির দেহ ১লা মে ১৯৯৯ সালে উদ্ধার করা হয়।

৩) এটি নিশ্চিত নয় যে জর্জ ম্যালোরি এভারেস্টের চূড়ায় পৌছাতে পেরেছিলেন কি না। যদিও 'জর্জ ম্যালোরি'র মৃতদেহের পারিপার্শ্বিক ও আনুষঙ্গিক তথ্যাদি থেকে বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে ম্যালোরি হয়তো এভারেস্টের চূড়া থেকে নীচে নামছিলেন।

পত্রিকার উন্নতিকল্পে আমার অনুরোধ উপরিউক্ত তথ্যগুলি পুনর্যাচাই করে যদি সঠিক তথ্য তুলে ধরেন।

ধন্যবাদন্তে,
প্রলয় মুখার্জি
ডায়মন্ড পার্ক, কোলকাতা-১০৪

মাননীয় প্রলয়,

আপনার দেওয়া তথ্য আমরা যাচাই করে দেখার পরে আমাদের তথ্যের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করে নিয়ে আপনার তথ্য যে সঠিক তা স্বীকার করছি ও ভবিষ্যতে তথ্যের ব্যাপারে আমরা আরও সর্তক থাকবো। আপনাকে ধন্যবাদ এবং পত্রিকার উন্নতিকল্পে আপনার এই প্রয়াসকে সাধুবাদ।

'সমীক্ষণ' পড়ুন ও পড়ান
বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ'র সদস্য হোন

সংগঠন সংবাদ ঃ

বিভিন্ন অঞ্চলের রিপোর্ট

উত্তরবঙ্গ ঃ

গত অগাস্ট মাসের ২০ থেকে ২৩ তারিখ উত্তরবঙ্গের দার্জিলিঙ, কোচবিহার এবং উত্তরদিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্কুল এবং রাস্তার মোড়ে সংগঠন এনসেফালাইটিস কী, এর প্রকোপ বাড়ছে কেন, এর চিকিৎসা কী এবং প্রতিকারের পথ কী-এইসব বিষয় নিয়ে এক প্রচার কর্মসূচী চালায়। আমরা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ডাক্তার এবং ডাক্তারি ছাত্রদের মতামত সংগ্রহ করি। শিলিগুড়ির মহানন্দা নদীর পাড়ের হিন্দী হাইস্কুল, বাগডোগরার নেপালী হাইস্কুল এবং চা-বাগান অধ্যুষিত বেলগাছি টি এস্টেট অঞ্চলের হিন্দী হাইস্কুলে এবং উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর সাবডিভিশনের (গোয়ালপোখর থানা) লস্করগাঁও এফ পি স্কুলে এনসেফালাইটিস সম্পর্কে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করি। প্রতিটি স্কুলে ছাত্র-শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারিরা বিপুল উৎসাহ নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। ছাত্র-শিক্ষকরা নানা প্রশ্ন তোলেন। গরীব মানুষের পুষ্টির অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এই রোগ বিস্তার ঘটাচ্ছে এই বিষয় সকলে একমত হন। টীকাকরণ কর্মসূচী ঠিকভাবে হচ্ছে না এই অভিযোগ ওঠে। লস্করগাঁও এফ পি স্কুলের অনুষ্ঠানে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বলেন আশু করণীয় কী? সকলে বলেন গ্রামে পায়খানা নাই। সরকারি টাকায় ঘরে ঘরে পায়খানা বানাতে হবে। সদস্য এটা করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং গরীব মানুষকে খাদ্য সরবরাহেরও প্রতিশ্রুতি দেন। বেলগাছি টি এস্টেটের প্রধান শিক্ষককে আমরা চা-বাগান এলাকার শিক্ষার হালহকিকত জানতে চাই। তিনি আমাদের সাক্ষাৎকার দেন তা পৃথকভাবে প্রকাশ করা হল। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ডাক্তারদের মতামতও পৃথকভাবে দেওয়া হল।

শিলিগুড়ি শিবমন্দির মোড়ে এবং কোচবিহার শহরে আমরা পথসভা করি। এই সভাগুলিতেও প্রচুর মানুষ আমাদের মতামত শোনেন এনসেফালাইটিস প্রসঙ্গে। প্রচুর সমীক্ষণ বিক্রি হয়।

আসানসোল ঃ

গত ৩১ শে অগাস্ট আসানসোলের কর অ্যাসোসিয়েশন হলে বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রচুর ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক-কর্মচারি এবং অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ছাত্ররা 'সমাজ জীবনে মিডিয়ার ভূমিকা' নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সমীক্ষণ প্রসঙ্গে পাঠক কৌশক হালদার সমীক্ষণ পড়তে সকলকে আহ্বান করেন। অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে এনসেফালাইটিস নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখা হয়। 'অলৌকিক না লৌকিক'-এই নিয়ে কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান করা হয় এবং সবশেষে 'মনুপ্রকৃত বিশ্ব উষ্ণায়ণ সত্য না কল্পিত?' শিরোনামে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বেহালা-ঠাকুরপুকুর ঃ

গত ৩০শে আগস্ট ২০১৪ তারিখে বিজ্ঞান মনস্ক-র উদ্যোগে কলকাতার ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে 'এনসেফালাইটিস' রোগের কারণে উত্তরবঙ্গ সহ পশ্চিমবঙ্গ এমনকি কোলকাতাতেও মৃত্যু ঘটছে এবং সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দৈন্যদশার কথা তুলে ধরতে 'অখিল ভারত প্রগতিশীল ছাত্র মঞ্চ'-র সাথে ঐক্যবদ্ধ মিছিলে অংশ নেয়।

সোনারপুর ঃ

গত ৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ সোনারপুরের স্টেশন সংলগ্ন চত্বরে বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে 'এনসেফালাইটিস' কে উপলক্ষ করে মুখপত্র সমীক্ষণে রচিত বিশেষ সংখ্যার প্রচার ও 'এনসেফালাইটিস' রোগের উৎস, কারণ ও এর ফলে ঘটে চলা মানুষের মৃত্যুকে ঠেকানোর উপায় নিয়ে পথসভার আয়োজন করা হয়।

লক্ষীকান্তপুর ঃ

গত ২৪শে আগস্ট, ২০১৪ তারিখে দঃ ২৪ পরগণার লক্ষীকান্তপুরে 'বর্তমান দিনে সমাজতন্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা ও সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা ও যুক্তির নিরিখে ভাবনা' এই বিষয়ের উপর এক আলোচনা সভার আয়োজিত হয়, বিভিন্ন সংগঠন থেকে বিভিন্ন প্রতিনিধিরা সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে ও আলোচনার বিষয় বস্তু সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করেন। বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে বলা হয় যে তাদের কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ জনগণের মধ্যে টিঁকে থাকা অলৌকিকবাদ, ভাববাদ ইত্যাদির বিরোধিতা করা ও টিঁকে থাকার কারণকে জনগণের সামনে উন্মোচন করা ও বিজ্ঞানের সুফলকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়গুলি যে সমাজ ব্যবস্থায় সম্ভব সেই সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে একটি সহযোগী শক্তি হিসাবে কাজ করা।■

বেলগাছি হিন্দি হাই স্কুলের
প্রধান শিক্ষক শ্রী সুরেশ বৈঠা

সাক্ষাৎকার ঃ

তরাইয়ের চা বাগিচায় শিক্ষার চালচিত্র

"এরাই অঞ্চলের প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া" – প্রধান শিক্ষক

[*গত ২১শে অগাস্ট ২০১৪, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার চা-বাগান অধ্যুষিত বেলগাছি হিন্দি হাই স্কুলে আমরা গিয়েছিলাম এনসেফালাইটিস রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং স্থানীয় মানুষ এতে ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী সুরেশ বৈঠার কাছে শিক্ষার অবস্থা জানার জন্য একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় যাতে এলাকার শিক্ষার চালচিত্র ফুটে উঠেছে।* – সম্পাদকমন্ডলী]

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ আপনাদের স্কুলে ছাত্রছাত্রী কত?

প্রধান শিক্ষক ঃ প্রায় ১৮০০ জন।

বি.ম. ঃ এরা কোন এলাকা থেকে স্কুলে আসে?

প্র.শি. ঃ বেলগাছি, লোহাগড়, আশপুর, তিরানা, ওট ...।

বি.ম. ঃ এদের মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যা কত?

প্র.শি. ঃ স্কুলের ৮০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীই আদিবাসী সম্প্রদায়ের।

বি.ম. ঃ এদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা কেমন?

প্র.শি. ঃ মোটেই ভাল নয়। তবুও এই অবস্থার মধ্যেই এরা পড়াশুনো করছে। এরাই অঞ্চলের প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া।

বি.ম. ঃ তার মানে এদের পরিবারে শিক্ষার কোনও চল ছিল না?

প্র.শি. ঃ না।

বি.ম. ঃ অনেকে ছাত্রদের মেধার প্রশ্ন তোলে, আপনারা পড়িয়ে কী দেখেন?

প্র.শি. ঃ আমি কোয়ালিটি এডুকেশন নিয়ে কোনও তর্ক করব না। তা কতটা দিতে পারছি তা বলতে পারব না, তবে কোয়ানটিটি এডুকেশন মানে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

বি.ম. ঃ এই বিষয় সরকারের সাহায্য কেমন পাচ্ছেন?

প্র.শি. ঃ যা যা সরকারি সাহায্য আছে পাচ্ছি।

বি.ম. ঃ স্কুলে মোট ছাত্র এবং শিক্ষক কত জন?

প্র.শি. ঃ আমাকে নিয়ে ১৩ জন স্থায়ী শিক্ষক, ২ জন প্যারাটিচার, ১ জন ক্লার্ক এবং ২ জন পিওন নিয়ে মোট ১৮ জন।

বি.ম. ঃ ১৮ জন শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী নিয়ে ১৮০০ ছাত্রছাত্রী? আপনার স্কুলে শিক্ষকের পদ খালি নেই?

প্র.শি. ঃ স্কুলে সরকারি নিয়ম অনুসারে ২৮টি ফ্রেশ, ৩টি ব্যাকওয়ার্ড মিলে ৩১ এবং ২ জন চলে যাওয়ায় ৩৩টি পদের গ্রান্ট আছে। আমি খুলে বলতে চাই না ... কিছু রাজনৈতিক কারণে এত পদ খালি আছে। ছাত্রছাত্রীরা সাফার করছে।

বি.ম. ঃ স্কুলে ছেলে ও মেয়ের অনুপাত কেমন?

প্র.শি. ঃ এখানকার ভাল দিক, ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি পড়তে আসে।

বি.ম. ঃ এর কোনও সামাজিক কারণ আছে?

প্র.শি. ঃ সামাজিক কারণ? শিক্ষার দিকে আগ্রহ বাড়ছে।

বি.ম. ঃ নাকি গরীব পরিবারে বাড়ির লোকেরা ছেলেদের আগে কাজে নামিয়ে দেয়?

প্র.শি. ঃ এটা খুব ভাল প্রশ্ন করেছেন। অঞ্চলের সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ, কাজের জন্য ছেলেরা বেড়িয়ে যায়। এর ফলে ছেলেদের সংখ্যা কমছে, মেয়েদের তুলনায়। কিন্তু এখানে হিউম্যান ট্রাফিকিং আছে অর্থাৎ মেয়ে পাচার হয়। তবে এখন কিছুটা কমেছে।

বি.ম. ঃ এই স্কুল কতটা এলাকার মানুষদের কভার করে?

প্র.শি. ঃ একদিকে ১৪ কিমি আগে বাগডোগরায় একটি হিন্দি স্কুল আছে আর অন্যদিকে ১৮ কিমি দূরে খড়িবাড়িতে অন্য একটা হিন্দি স্কুল আছে, মাঝে ২টি আন-এইডেড হিন্দি স্কুল আছে। বাংলা স্কুল আছে তবে ১০-১২ কিমি সারাউন্ডিং-এ এটাই একমাত্র সরকারি হিন্দি মাধ্যম স্কুল।

বি.ম. ঃ এলাকার জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দিভাষী মানুষ কত?

প্র.শি. ঃ আদিবাসীর সংখ্যা অঞ্চলে সর্বাধিক, এরা

অধিকাংশই প্রথম ভাষা হিসাবে হিন্দি মাধ্যমে পড়ে। সেই হিসাবে এলাকার ৮০ শতাংশ মানুষই তো হিন্দিভাষী, মানে হিন্দি মাধ্যমে পড়াশুনো করে।

বি.ম. ঃ স্কুলে মিড ডে মিল রয়েছে কোন ক্লাস পর্যন্ত?

প্র.শি. ঃ পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত।

বি.ম. ঃ নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা শুধু দেখে, খায় না?

প্র.শি. ঃ এব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। তবে সরকারি আদেশ আমরা পালন করি।

বি.ম. ঃ আপনার কি মনে হয় শিক্ষার জন্য যে পরিবেশ দরকার তা এখানে যথেষ্ট আছে?

প্র.শি. ঃ আর টি অ্যাক্ট অনুসার স্কুলে ছাত্র : শিক্ষক ৪০ : ১ হওয়ার কথা। আমার দুর্ভাগ্য, অঞ্চলের মানুষের দুর্ভাগ্য ছাত্ররা তা পাচ্ছে না।

বি.ম. ঃ ছাত্রদের বাবা-মায়েরা ওদের বইপত্র জোগান দিতে পারে?

প্র.শি. ঃ না নিশ্চয়ই পারে না। তবে পড়াশুনা না করাটারও কোন কারণ নেই। বুক গ্রান্ট আছে, এরা মেইনটেনান্স গ্রান্ট পায়। এই টাকা যদি ঠিকভাবে ইউটিলাইজ করে তবে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

বি.ম. ঃ সর্বশিক্ষা মিশনের ঘোষণা অনুসারে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পড়ার কথা আছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এদের কোনও ফিজ নেই তো?

প্র.শি. ঃ না, সরকারি আইন অনুযায়ী, প্রত্যেকের কাছ থেকে বছরে ২৪০ টাকা আমরা নিয়ে থাকি।

বি.ম. ঃ এপিএল/বিপিএল সকলের কাছ থেকে?

প্র.শি. ঃ হ্যাঁ সকলের কাছ থেকে। আমরা কাউকে বাধ্য করতে পারি না, কিন্তু সকলের থেকেই নেওয়া হয়, এটাই নির্দেশ আছে।

বি.ম. ঃ স্কুলের চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, ইলেকট্রিক খরচ ... কি সরকার থেকে পান?

প্র.শি. ঃ না পাই না। ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে যে ২৪০ টাকা করে জোগাড় করি তা থেকেই এর খরচ করি।

বি.ম. ঃ এই স্কুল থেকে মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্ররা বসছে কবে থেকে?

প্র.শি. ঃ এখান থেকে মাধ্যমিকের প্রথম ব্যাচ বসেছে ২০০৮ সালে আর উচ্চ মাধ্যমিক ২০১২ সালে।

বি.ম. ঃ পাশের হার কত?

প্র.শি. ঃ কি বলব, কোয়ালিটি এডুকেশন তো দিতে পারছি না, কোয়ানটিটি এডুকেশন দিয়ে যাচ্ছি। পাশের হার কোনও সময় ৫০-৫৫ শতাংশ আবার কখনও ৩৮-৪০ শতাংশ।

বি.ম. ঃ এই স্কুল থেকে ভাল রেজাল্ট মানে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে কেউ?

প্র.শি. ঃ হ্যাঁ, প্রায় সব বছরই ২/৪ জন পেয়ে থাকে। একবার একটা ছেলে তো অঙ্কে ১০০ তে ১০০ পেয়েছে।

বি.ম. ঃ আদিবাসী ছেলে?

প্র.শি. ঃ না, বিহারী ছেলে। প্রতি বছরই ৪-৫ জন মোটামুটি ভাল রেজাল্ট করে থাকে।

বি.ম. ঃ খবর রাখেন এদের মধ্যে কজন উচ্চশিক্ষা পাচ্ছে।

প্র.শি. ঃ চেষ্টা করেছে কয়েকজন। একটা ছেলে শিলিগুড়ির দেশবন্ধু স্কুল থেকে সায়েন্স নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে, তবে খুব ভালো রেজাল্ট নয়। যেহেতু সব কলেজে এসটি'তে একটা পোস্ট থাকে, তাই ইচ্ছে থাকলেও কোথাও ভর্তি হতে পারে নি। আমি ওকে আর্টস নিয়ে নকশালবাড়ি কলেজে ভর্তি হতে বলেছি।

বি.ম. ঃ আপনাদের কাজের চাপ কেমন?

প্র.শি. ঃ কি আর বলব, আমিই প্রধান শিক্ষক, আমিই হেড ক্লার্ক, আমিই মাঝে মাঝে হেড কুক আবার আমিই স্কুল বিল্ডিং তৈরীর হেড মিস্ত্রি। সব শিক্ষকদেরই নানা চাপ আছে, ম্যান পাওয়ার কম।

বি.ম. ঃ পড়াশুনো ছাড়া সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজকর্ম স্কুলে হয়?

প্র.শি. ঃ হ্যাঁ স্পোর্টস হয়, সব সরকারি প্রোগ্রামে আমরা পার্টিসিপেট করি।

বি.ম. ঃ আমাদের সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমরা সাধারণ মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সমস্যা এবং সমাজের প্রকৃত চিত্র সমীক্ষণে তুলে ধরার চেষ্টা করি। মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত ও বিজ্ঞান সচেতন করার চেষ্টা করি। আপনাদের স্কুলে এনসেফালাইটিস নিয়ে প্রোগ্রাম করার সুযোগ দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

প্র.শি. ঃ এই আদিবসী অধ্যুষিত অঞ্চলে আপনাদের বিজ্ঞান ও সমাজ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করার জন্য আপনাদেরও অশেষ ধন্যবাদ। ■

২০১৪ সালে উত্তরবঙ্গে এনসেফালাইটিসের প্রকোপ

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ডাক্তারদের মতামত

[*২০ এবং ২১শে অগাস্ট ২০১৪, আমরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এনসেফালাইটিস নিয়ে অনুসন্ধান করি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এই অসুখ সম্পর্কে সচেতনতাবৃদ্ধির কর্মসূচীর সময় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ডাক্তারদের কাছে মতামত জানতে যাই। কলেজের অধ্যাপক ডাক্তাররা আমাদের সামনে মুখ খোলেননি। একটা ভয়ার্ত পরিবেশের কারণে অধিকাংশ মেডিকেল ছাত্র এবং জুনিয়র ডাক্তার আমাদের এড়িয়ে গেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন মেডিকেল ছাত্র এবং জুনিয়র ডাক্তার তুষার কান্তি সরকার আমাদের কাছে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই অভিমতের গুরুত্ব অনুভব করে সংক্ষেপে তা পাঠকদের কাছে তুলে ধরলাম।* – সম্পাদকমন্ডলী]

মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা আমাদের যা বললেন তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ উত্তরবঙ্গে এনসেফালাইটিস, ডেঙ্গু প্রভৃতি ভাইরাসঘটিত অসুখ এবং ম্যালেরিয়ার মত প্রোটোজোয়া ঘটিত অসুখ দীর্ঘদিন ধরে বারে বারে আউটব্রেক হচ্ছে। এবছর জুন মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে আউটব্রেক শুরু হয়েছে। অধিকাংশ রোগী এসেছেন জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগান অঞ্চল, কোচবিহার থেকে। কিছু দার্জিলিং-এর তরাই এলাকা, উত্তর দিনাজপুর এবং মালদহ থেকে। এর ভাইরাস তার ইনকিউবেশন পিরিয়ড বার বার বদল করে। জাপানী এনসেফালাইটিস (জে ই) এবং অ্যাকিউট এনসেফালাইটিস সিনড্রোম (এ ই সি) প্রতিবছরই থাকে। মানুষের সচেতনতা বাড়ায় এবার বেশি রোগী এসেছে, আগে হয়ত গ্রামে পড়ে থেকে 'অজানা অসুখ'-এ মারা যেত। আগে ধারণা ছিল এই অসুখ বাচ্চাদের বেশি হয়। এবার বয়স্ক মানুষ বেশি ভর্তি হয়েছেন এবং অনেকেই মারা গেছেন। যারা বেঁচে ফিরেছেন তাঁদের অনেকে বোবা হয়ে গেছেন, পঙ্গু হয়েছেন, স্মৃতিশক্তি হারিয়েছেন। এঁদের ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসা করাতে হবে। হাসপাতালে সাহায্যকারী চিকিৎসা দেওয়া হয়। এবার শিশুরা কম এসেছেন কারণ বিভিন্ন এলাকায় ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল। এবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে এই অসুখে মৃত্যুর হার ৪০-৪৫ শতাংশ। অধিকাংশ মানুষ অত্যন্ত গরীব হওয়ায়, তাদের অপুষ্টির কারণে এই ভাইরাসের প্রকোপে আক্রান্ত এবং মৃত্যুর হার বেশি। আউটব্রেক হওয়ার ১৫ দিন পর এখানে রক্ত এবং অন্য পরীক্ষার কিট এসেছে। ১০টা স্যাম্পেল পাঠানো হয়েছিল

পরীক্ষার জন্য তার মধ্যে ৬টিতে জে ই ধরা পড়েছে। শুকরদের সরাবার অভিযান হলেও তাদের রক্ত পরীক্ষা হয়নি। বিদেশে শূকরদের ভ্যাকসিনেশন করা হয়। এখানে খামারে শূকর চাষের যে নির্দেশিকা থাকে তা মানা হয়নি। মালদা জেলায় লিচু খেয়ে শিশু মৃত্যুর যে খবর প্রচার হয়েছিল তা গুজব। এরা এনসেফালাইটিসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে তবে তা জে ই হয়ত নয়।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ডাক্তার তুষার কান্তি সরকার খোলাখুলিভাবে তাঁর মতামত পেশ করেছেন। তাঁর মতামতের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ

এখানে মেডিসিন বিভাগে ডাক্তার মাত্র ৫ জন অথচ প্রতিদিন গড়ে ৮০-১০০ জন রোগী ভর্তি হন। সাধারণ প্যারাসিটামল থেকে প্রায় সব ধরণের ওষুধই রোগীদের কিনতে হয়। বেডের সংখ্যা অপর্যাপ্ত। পানীয় জল, খাবার কিছুই ঠিক নেই। কোন রোগীর এইচ আই ভি, কার হেপাটাইটিস জানা নেই তবুও সাবধানতা ছাড়া সকলের রক্ত টানতে হয়। বার বার ডেপুটেশন দিয়েও কোনও প্রতিকার পাই নি। এবার এনসেফালাইটিস আউটব্রেক-এর সময় দীর্ঘদিন কোনও কিট ছিল না। ল্যাবরেটরি ফেসিলিটি ২৪ ঘন্টা থাকে না। সর্বত্র একটা চাপের পরিবেশ রয়েছে। আমরা এর প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট করেছি। ৭ই অগাস্ট আমরা এর প্রতিবাদে মিছিল করে ক্যাম্পাসের সামনে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করি। তারপর বলা হল ক্যাম্পাসে পোস্টার মারা বা মিছিল করা চলবে না। আমাদের রেজিস্ট্রেশন দেবে না বলে ভয় দেখানো হচ্ছে। আগের সরকারের সময়ও অবস্থা খারাপ ছিল তবে এখন অবস্থা ভয়ঙ্কর। আমাদের শিক্ষকরা সামনে না এলেও সভার পুলিশ পারমিশন করিয়ে দেওয়া, আর্থিক সাহায্যদান ইত্যাদি করেছেন। এবার এনসেফালাইটিসে উত্তরবঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যা দুইশ'র বেশি। সবগুলো অবশ্য ডিটেক্ট করা যায় নি। বহু কেস চেপে দেওয়া হয়েছে। প্রথম ৫/৬ দিনে ৫৫ জন রোগীর মধ্যে ৩২ জনই মারা গেছেন। এখানে রোগী শুধু উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে নয়, বাংলাদেশ, নেপাল, অসম, বিহার থেকেও আসে। অধিকাংশই গরীব মানুষ, পুষ্টির অভাব, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই। গত বছর ডেঙ্গুর আউটব্রেক হয়েছে। তখন অতিরিক্ত ওয়ার্ড খুলতে হয়েছিল পরিকাঠামো ছাড়াই। বেশি মারা যায়নি তাই রক্ষে। উত্তরবঙ্গে গরীব মানুষের সাধারণ হেলথ খুব খারাপ। হাসপাতালে ডাক্তার পর্যাপ্ত নেই, ওষুধ নেই, স্যালাইন নেই, সিস্টার-গ্রুপ ডি স্টাফ নেই। ডাক্তারদের ট্রলিও ঠেলতে হয়। একজন ডাক্তার দিনে ক'জন রোগী দেখতে পারে! চাকরি দিচ্ছে কই? যা দিচ্ছে তাও চুক্তির ভিত্তিতে। সরকারি চিকিৎসাকে পঙ্গু করে বেসরকারি চিকিৎসাকে মদত দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালে ডাক্তারি ছাত্রের সিট বাড়ানোর পরিকল্পনার পিছনে বেসরকারি হাসপাতালগুলির মদত আছে। আমি মনে করি এখানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাড়াও আরও অন্তত ২টি সরকারি উদ্যোগে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়া প্রয়োজন। আরও ভাল ডাক্তার তৈরি করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ উন্নত চিকিৎসা পায়। একজন ডাক্তার সাধারণ মানুষকে বেশি একত্রিত করতে পারেন যেমন ড: বিনায়ক সেন। তাঁর গ্রেফতারের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করেছি। স্বাস্থ্য একটি সামাজিক অধিকার এই দাবিতে গণ আন্দোলন গড়ে ওঠা প্রয়োজন। ■

পত্রিকা যে সমস্ত স্টলে পাওয়া যায়

- ❖ **বুকমার্ক, কলেজস্ট্রীট, কোলকাতা**
- ❖ **মণীষা, কলেজস্ট্রীট, কোলকাতা**
- ❖ **টেলিফোন ভবনের বিপরীতের স্টলগুলিতে, কোলকাতা**
- ❖ **রাসবিহারী মোড়, কোলকাতা**
- ❖ **খড়দহ স্টেশন, উত্তর ২৪ পরগণা**
- ❖ **সোনারপুর স্টেশন স্টল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা**
- ❖ **বিদিশা পেপার হাউস, তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ডের বিপরীতে, শিলিগুড়ি**
- ❖ **বৈচিত্র, ঠাকুরপুকুর ৩এ বাসস্ট্যান্ডের স্টল, কোলকাতা**
- ❖ **বেহালা ট্রাম ডিপোর স্টল, কোলকাতা**
- ❖ **পোড়া অশ্বত্থতলার মেজদার স্টল, কোলকাতা**
- ❖ **গড়িয়াহাট**
- ❖ **ঢাকুরিয়া**
- ❖ **গোলপার্ক**
- ❖ **গড়িয়া বাস স্ট্যান্ড**
- ❖ **যাদবপুর স্টেশন**
- ❖ **বেলঘরিয়া স্টেশন**
- ❖ **সোদপুর স্টেশন**

বিজ্ঞানের খবর

জুলাই

২.* নাসার 'ক্যাসিনি মিশন' থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে জানা গেছে যে শনি গ্রহের সবচাইতে বড় উপগ্রহ 'টাইটান'-এর একটি সমুদ্রের মতো জায়গা পৃথিবীর 'ডেড সি'-এর মতো লবণাক্ত। (তথ্যসূত্র ঃ নাসা)

৩.* বিশ্বের তেরোটি সংস্থার সংগঠিত গবেষণার ফল হিসাবে 'অটিজম' রোগের জন্য দায়ী জিনটির খোঁজ পাওয়া গেছে। ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন-এর তত্ত্বাবধানে সংঘটিত গবেষণায় জানা গেছে যে সি. এইচ. ডি-৮ নামক জিন-এর মিউটেশান-ই 'অটিজম'-এর জন্য দায়ী। (তথ্যসূত্র ঃ সায়েন্স ডেইলি)

৭.* আমেরিকার সাউথ ক্যারোলিনায় আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্ববৃহৎ পাখির ফসিল পাওয়া গেছে। আড়াই কোটি বছরের পুরানো এই ফসিলটি থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী পাখিটির ডানার ব্যাপ্তী ছিলো কুড়ি থেকে চব্বিশ ফুট। (তথ্যসূত্র ঃ বিবিস ইউ. কে)

১০.* নাসার 'মার্স রেকোনেইসেন্স অরবিটার' (এম. আর. ও)-এর পাঠানো ছবি বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে মঙ্গলের পৃষ্ঠতলে এক ধরণের নালা বা সংকীর্ণ খাত উপস্থিত আছে যেগুলোতে প্রধানত শুষ্ক বরফ বা ড্রাই আইস আছে। (তথ্যসূত্র ঃ নাসা)

১৪.* ইউনাইটে স্টেট জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউ. এস. জি. এস)-র পক্ষ থেকে মঙ্গল গ্রহের ভূ-তাত্ত্বিক ম্যাপ বা জিওলজিক্যাল ম্যাপ প্রকাশ করা হয়েছে। 'ভাইকিং অরবিটার' থেকে প্রাপ্ত ছবি ও বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে এই ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। (তথ্যসূত্র ঃ ইউ. এস. জি. এস)

১৭.* ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটা-র গবেষকদের দ্বারা প্রস্তুত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে খাদ্য ব্যবস্থাকে যদি নির্দিষ্ট অঞ্চল ও নির্দিষ্ট ফসলের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নততর করা যায় তাহলে তা বর্তমানে পৃথিবীর আরও অতিরিক্ত তিনশো কোটি মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাদ্য-শক্তির যোগান দিতে পারবে। আর এর দ্বারা জমি ও পরিবেশ দুইয়েরই কোনও রূপ ক্ষতিসাধন হবে না। (তথ্যসূত্র ঃ ইউনির্ভাসিটি অফ মিনেসোটা)

২০.* কোষ বিভাজনের সময় জড়িত একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক বিক্ষেপের চিত্র প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে যার বিশ্লেষণ দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য ক্যানসার রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ঔষধের কাজে লাগবে। (তথ্যসূত্র ঃ নেচার পত্রিকা)

২১.* আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার টেম্পল ইউনিভার্সিটি-র গবেষকরা সফলভাবে মানব কোষ থেকে এইচ. আই. ভি ভাইরাসকে দূর করতে সক্ষম হয়েছে। টেম্পল ইউনিভার্সিটি-র ডিপার্টমেন্ট অফ নিউরোসায়েন্সের প্রধান অধিকর্তা ডঃ কামেল খলিলি-র মতে এইড্স রোগের স্থায়ী আরোগ্যের ক্ষেত্রে এই গবেষণার সফলতা এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। (তথ্যসূত্র ঃ টেম্পল ইউনিভার্সিটি)

২৩.* বৃটিশ-কলোম্বিয়ার গবেষকরা টিরানো সোরাস-এর এমন ফসিল আবিষ্কার করেছেন যে যার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করা যায় যে টিরানোসোরাসরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে শিকার করতো। (তথ্যসূত্র ঃ দ্য গার্ডিয়ান)

৩১.* দীর্ঘ মেয়াদী সময়ের জন্য দেহকোষ কে পুনর্গঠিত করে তা ইঁদুরের মস্তিষ্কে প্রতিস্থাপন করা গেছে যার ফলে দুর্বল বা অসুস্থ নিউরনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক নিউরন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা যাবে আর এর ফলে পারকিনসন রোগের এক দীঘমেয়াদী চিকিৎসা সম্ভবপর হবে। (তথ্যসূত্র ঃ স্টেপ সেল রিপোর্ট)

অগাস্ট

৪.* টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি. অ্যান্ডারসন ক্যানসার সেন্টার এবং পিটসবাগ গ্র্যাজুয়েট স্কুল অফ পাবলিক হেল্থ-এর গবেষকরা একটি কম্পিউটার সিমুলেশান-এর মাধ্যমে বলতে পারছেন যে ২০১৬ সালের মধ্যে হেপাটাইটিস-সি কে একটি বিরল রোগে পরিণত করা যেতে পারে চিকিৎসা শাস্ত্রের সম্ভাব্য উন্নতি ঘটানোর মাধ্যমে। (তথ্যসূত্র ঃ এম. ডি. অ্যান্ডারসন ক্যান্সার সেন্টার)

৭.* আই. বি. এম-এর বিজ্ঞানীরা নিউরোমরফিক অর্থাৎ মস্তিষ্কের মতো এমন এক কম্পিউটার চিপ বানিয়েছেন যেখানে ১০ লাখ প্রোগ্রাম করা সম্ভব নিউরোন ও প্রায় ২৫ কোটি প্রোগ্রাম করা সম্ভব সাইন্যাপস রয়েছে ৪০৯৬ টি নিউরোসাইন্যাপটিক কোষকে ঘিরে। অর্থাৎ মানুষের মস্তিস্কের কিছুটা সাদৃশ্যসম কম্পিউটার চিপের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে। (তথ্যসূত্র ঃ আই. বি. এম)

৮.* স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের তাদেরই অস্থিমজ্জা থেকে নেওয়া স্টেম সেল দ্বারা চিকিৎসা করার আশাব্যঞ্জক ফল পর্যবেক্ষণ

করেছেন লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের বিজ্ঞানীরা। অ্যাকিউট স্ট্রোকের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসার ফল এখনও প্রকাশিত করা বাকি আছে যদিও স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় এটি এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য। (তথ্যসূত্র ঃ ইম্পিরিয়াল কলেজ, লন্ডন)

১১.* সি/২০১২ এফ ৬ এবং সি/২০১২ এস১ (আই. এম. ও. এন) ধুমকেতু দুটিতে HCN, HNC, H_2CO_3 ও ধূলিকণার বিস্তার সম্বন্ধীয় গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে। ধূমকেতু সম্বন্ধীয় গবেষণায় এটি সাহায্যকারী এক গবেষণা। (তথ্যসূত্র ঃ নাসা)

১৪.* ১০০০ টি অতিক্ষুদ্র একঝাঁক রোবটের স্ব-সংগঠিত হওয়ার ঘটনাকে প্রকাশিত করলো হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়। এই অতিক্ষুদ্র রোবটের ঝাঁক নিজেরাই একবার ইংরেজী অক্ষর K ও আরেকবার নক্ষত্রের ন্যায় আকারের সৃষ্টি করে। (তথ্যসূত্র ঃ হাভার্ড স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যন্ড এপ্লায়েড সায়েন্স)

১৫.*অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশানাল ইউনিভার্সিটির লেসার পদার্থবিজ্ঞানীরা এমন এক এ্যাটমিক ফোর্স মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কার করেছেন যা একটি ভাইরাসের ওজনের সমান বলকে পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছে। (তথ্যসূত্র ঃ অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশানাল ইউনিভার্সিটি)

২০.* আন্টার্টিকার বরফের চাদরের তলায় প্রায় ২৬০০ ফুট নীচে অবস্থিত লেফ হুইলিয়ান্স-এ হাজার হাজার অনুজীবের সন্ধান পাওয়া গেছে। (তথ্যসূত্র ঃ নেচার পত্রিকা)

২০.* আধুনিক মানুষ এক নিয়ান্ডারথাল মানুষরা প্রায় ৬০০০ বছর ইউরোপে একসাথে অধিষ্ঠিত ছিল, এই সময়কালটা এখনও পর্যন্ত জানা সময়কালের ১০ গুণ। এই দুই জাতি এমনকি নিজেদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ও করতো। (তথ্যসূত্র ঃ বি. বি. সি. নিউজ)

২১.* বাংলাদেশের কম্পিউটার গবেষকরা এমন একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম বানাতে সক্ষম হয়েছেন যা কিনা এই প্রোগ্রামটি ব্যবহারকারীর আবেগের ৮৭% পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্সির ক্ষেত্রে এ এক অনন্য সাফল্য। (তথ্যসূত্র ঃ সায়েন্স ডেইলি)

২৪.*বিজ্ঞানীরা একটি ইঁদুরের দেহে সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল দেহ-প্রতিরোধ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ উৎপাদন করতে সম্ভবপর হয়েছে। যদিও মানুষের দেহে এই প্রয়োগের এখনও অনেক সময় বাকি তবে দেহাঙ্গ প্রতিস্থাপনের বদলে তাকে দেহের মধ্যে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এ এক অনন্য আবিষ্কার। (তথ্যসূত্র ঃ বি. বি. সি)

৩০.* এল. সি. জেড ৬৯৬ নামক ওষুধের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে যা কিনা কার্ডিয়োভাসকুলার ডিজিজ বা হৃদরোগের দ্বারা মৃত্যুর সম্ভাবনাকে আগেকার অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে ২০% কমিয়ে দিতে পারে। বিগত ১০ বছরের মধ্যে এই বিষয়ে চিকিৎসা গবেষণা ক্ষেত্রে এক অন্যন্য উন্নতি। (তথ্যসূত্র ঃ ইউরোপীয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি)

সেপ্টেম্বর

৩.*কোপেনহেগান ইউনিভার্সিটি-র একদল বিজ্ঞানী অস্ট্রেলিয়ার উপকূল থেকে প্রাপ্ত মাশরুম বা ছত্রাকের ন্যায় দেখতে এক ধরনের অতিক্ষুদ্র প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন যা এখনও পর্যন্ত প্রাণীজগতের কোনও শ্রেণীর বা বর্গের অন্তর্গত নয়, এটি একটি নতুন বর্গের প্রাণী। (তথ্যসূত্র ঃ বিবিসি নিউজ)

৩.* নিউরোসাইন্টিস্ট এবং রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারদের একটি আন্তর্জাতিক দল প্রায় ৫০০০ মাইল দূরে অবস্থিত দু'জন মানুষের মধ্যে মস্তিষ্ক থেকে মস্তিষ্কে তথ্য আদান প্রদাণের এক সফল প্রয়োগ করেছেন। একটি মানুষের মস্তিষ্কে অপর একজন মানুষের মস্তিষ্কের কার্যকলাপ অনুপ্রবেশ ঘটানোর মাধ্যমে এই তথ্যের আদান প্রদান সম্ভবপর হয়েছে। এই সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালীত হয়ে বেথ ইম্যায়েল ডিকনেস মেডিক্যাল সেন্টার দ্বারা। (তথ্যসূত্র ঃ সায়েন্স ডেইলি)

৪.* ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে অক্সিজেন প্রদানকারী জীবের অস্তিত্ত্ব আগেকার ধারণার থেকে আরও ৬ কোটি বছরের পুরানো অর্থাৎ এই ধরনের প্রাণীর অস্তিত্ত্ব ৩০০ কোটি বছর আগেও ছিল। (তথ্যসূত্র ঃ ট্রিনিটি কলেজ, ডাবলিন)

৫.* কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমব্রিজ গ্রাফাইন সেন্টার ও প্লাস্টিক লজিকের গবেষকরা এই প্রথম ট্রান্সিস্টার দ্বারা নির্মিত কোনও যন্ত্রে গ্রাফাইনকে ইলেক্ট্রনিক্স পিক্সেলে যা কোনও ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রের ডিসপ্লে-কে নির্ধারণ করে (যেমন-টিভি বা কম্পিউটার ইত্যাদি),ব্যবহার করতে পেরেছেন, এর দ্বারা এমন নমনীয় ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রের আবিষ্কার সম্ভব হবে যাকে সম্পূর্ণভাবে বাঁকানো সম্ভব হবে। (তথ্যসূত্র ঃ ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রিজ)

৭.*২০১৪ আর.সি নামক একটি অ্যাস্টেরয়েড পৃথিবীর প্রায় ১৯,৯০০ কি.মি পাশ দিয়ে চলে গেছে। (তথ্যসূত্র ঃ নাসা)

৮.* বৃহস্পতির চাঁদ ইউরোপাতে পাত সঞ্চালনের প্রমাণ মিলেছে, পৃথিবী ছাড়া এই প্রথম অন্য কোনও জ্যোতিষ্কে পাত-সঞ্চালনের (প্লেট টেকটনিক্স) প্রমাণ পাওয়া গেলো। (তথ্যসূত্র ঃ নাসা)

৮.* ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, লস এঞ্জেলেস্-এর জীববিজ্ঞানীরা এমন একটি জিনের সন্ধান পেয়েছেন যা বার্ধক্যের প্রক্রিয়াকে ৩০% পর্যন্ত ধীর করে দিতে পারে। এ. এম. পি.কে. নামক এই জিনকে ফ্রুট-ফ্লাই নামক এক ধরনের মাছির মধ্যে প্রয়োগের মাধ্যমে এই গবেষণা হয়েছে। (তথ্যসূত্র ঃ ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্ণিয়া, লস এঞ্জেলেস্)

৯.* চিলির লাস ক্যাম্পানাস অবজারভেটরিতে একদল বিজ্ঞানী জল দ্বারা সৃষ্ট বরফের এমন এক মেঘের সন্ধান পেয়েছেন যা আমাদের সৌরজগতের অন্তর্গত নয়। সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহে জল দ্বারা সৃষ্ট বরফের মেঘের সন্ধান পাওয়া গেলেও সৌরজগতের বাইরে বরফ মেঘের সন্ধান এই প্রথম। (সায়েন্স ডেইলি)

১১.* শিকাগো ইউনিভার্সিটি-র জীবাশ্ববীদেরা সাহারা মরুভূমিতে স্পাইনোসোরাস নামক এমন এক ডাইনোসোরাসের ফসিল পেয়েছেন যা ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এবং সাঁতার কাটতে সক্ষম এক ডাইনোসোরাস। (বিবিসি নিউজ)

১২.* গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির গবেষকদের দাবী অনুযায়ী তারা জল থেকে হাইড্রোজেনকে জ্বালানী হিসাবে উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি দ্রুত, পরিষ্কার এবং সস্তা। এই হাইড্রোজেন সূর্য এবং বাতাস থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ধরে রাখতে পারে। (বিবিসি নিউজ)

১৯.*স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকরা এমন এক ধরণের প্রোটিন প্রস্তুত করেছেন যা 'মেটাস্টেসিস'কে, যা আসলে ক্যানসারকে এক কোষ থেকে অন্য কোষে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া, বাড়তে বাধা দেয়। এর ফলে ক্যানসারের ছড়িয়ে পড়া আটকে দেওয়া যেতে পারে। (স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি)

২৯.*ইম্পেরিয়াল কলেজ, লন্ডন ও জার্মানির ফ্রেডারিখ-মিলার ইউনিভার্সিটি, জেনা'র পদার্থবিদরা এমন এক লেসার রশ্মির আবিষ্কার করেছেন যা আলো এবং পদার্থের আন্তক্রিয়াকে প্রায় ১০ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে। সুপার রেসিলিউশান ইমেজ এবং বায়োমেডিকেল ডিটেকশনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসাবে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। (ইম্পেরিয়াল কলেজ, লন্ডন)

অক্টোবর

৩. * ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভ্যর্সিটির একদল গবেষক কার্বন-ডাই-অক্সাইড-কে ভেঙে কার্বন ও অক্সিজেনকে আলাদা করতে সক্ষম হয়েছেন। এতদিন পর্যন্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড কে ভেঙ্গে কার্বন-মনো-অক্সাইড ও অক্সিজেন পাওয়া যেত, এই প্রথম কার্বন ও অক্সিজেনকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে সম্পূর্ণ রূপে আলাদা করে পাওয়ার পদ্ধতির মাধ্যমে মহাশূন্যে বা সমুদ্রের তলায় আলাদা করে অক্সিজেন সিলিন্ডার বহন না করে মানুষের নিশ্বাসের সাথে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকেই অক্সিজেন প্রস্তুত করার যন্ত্র আবিষ্কার করা যেতে পারে। (ফিজ. ও. আর. জি)

৩.* ওহায়ো স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকরা এমন একটি হাইব্রিড সোলার ব্যাটারি আবিষ্কার করেছেন যে তার নিজেরই শক্তিকে ন্যানোমিটার সাইজের টাইটেনিয়াম ডাই অক্সাইড রড ধরে রাখতে সক্ষম। এর ফলে সৌরশক্তি দ্বারা চালিত ব্যাটারির ক্ষমতা ও কার্যকারীতা আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব। (ওয়াহো স্টেট ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা)

৯.* হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি-র বিজ্ঞানীরা ভ্রুণস্থ স্টেম সেল কে এমন একটি কোষে পরিবর্ত্তিত করতে সক্ষম হয়েছেন যা বিনা শরীরে ইনসুলিন প্রস্তুত করতে পারে। এই গবেষণা ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। (হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল)

১৩.* নানীয়াং টেকনোলজিকাল ইউনিভার্সিটি-র গবেষকরা এমন এক ব্যাটারী বানাতে সক্ষম হয়েছেন যা ২ মিনিটে ৭০% পর্যন্ত রি-চার্জ হতে পারে এবং এর আয়ুষ্কাল প্রায় ২০ বছর। (নানীয়াং টেকনোলজিকাল ইউনিভার্সিটি, সিঙ্গাপুর)

১৫.* লকহিড মার্টিন করপোরেশন-এর গবেষকরা এমন একটি নিউক্লিয়ার ফিউশান রিঅ্যাক্টর বানিয়েছেন যা একটি ট্রাকের সাইজের। (নিউ ইয়র্ক টাইম্স)

১৬.* ব্রিটেনের লিসেস্টার ইউনিভার্সিটি-র গবেষকরা ডার্ক ম্যাটার বা কৃষ্ণবস্তু যা দিয়ে তৈরী সেই 'এক্সিওন' কণা, এই কণা আসলে একটি হাইপোথেটিকাল কণা, খুঁজে পেয়েছেন। (লিসেস্টার ইউনিভার্সিটি, ব্রিটেন)

১৭.* ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটি-র বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম মেকানিক্স/মলিকিউলর মেকানিক্সের সাহায্যে অ্যান্টি বায়োটিকের প্রতিরোধ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ভাবে জানতে পেরেছেন। এই গবেষণার ফলে আরও উন্নততর অ্যান্টি বায়োটিক ওষুধের আবিষ্কার সম্ভব হবে। (ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটি)

২১.* পোল্যান্ডের একদল সার্জন ও লন্ডনের একদল বিজ্ঞানীরা মিলে একজন প্যারালাইজড বা পঙ্গু রোগীকে তার নাকের কোষকে মেরুদন্ডে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সুস্থ করে তুলতে পেরেছেন। পঙ্গু রোগীকে সুস্থ করার এই সফল প্রয়াস সারা বিশ্বে এই প্রথম। (বিবিসি নিউজ)

ইসলামপুর ঃ লস্কর গাঁও এফ পি স্কুলে বিজ্ঞান মনস্ক'র অনুষ্ঠান

বাগডোগরা ঃ নেপালি হাই স্কুলে বিজ্ঞান মনস্ক'র অনুষ্ঠান

বেলগাছি হিন্দি হাই স্কুলে বিজ্ঞান মনস্ক'র অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুলে বিজ্ঞান মনস্ক'র অনুষ্ঠান

বেহালা ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে বিজ্ঞান মনস্ক'র মিছিল

বেলেগাছি হাইস্কুলের অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের বিপুল অংশগ্রহণ

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, দিপ্তীকণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১৪ মাঝিপাড়া রোড, ফ্ল্যাট নম্বর এ ২, কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com